ইসকনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র
অমৃতের সন্ধানে

শ্রীশ্রী গুরু—গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
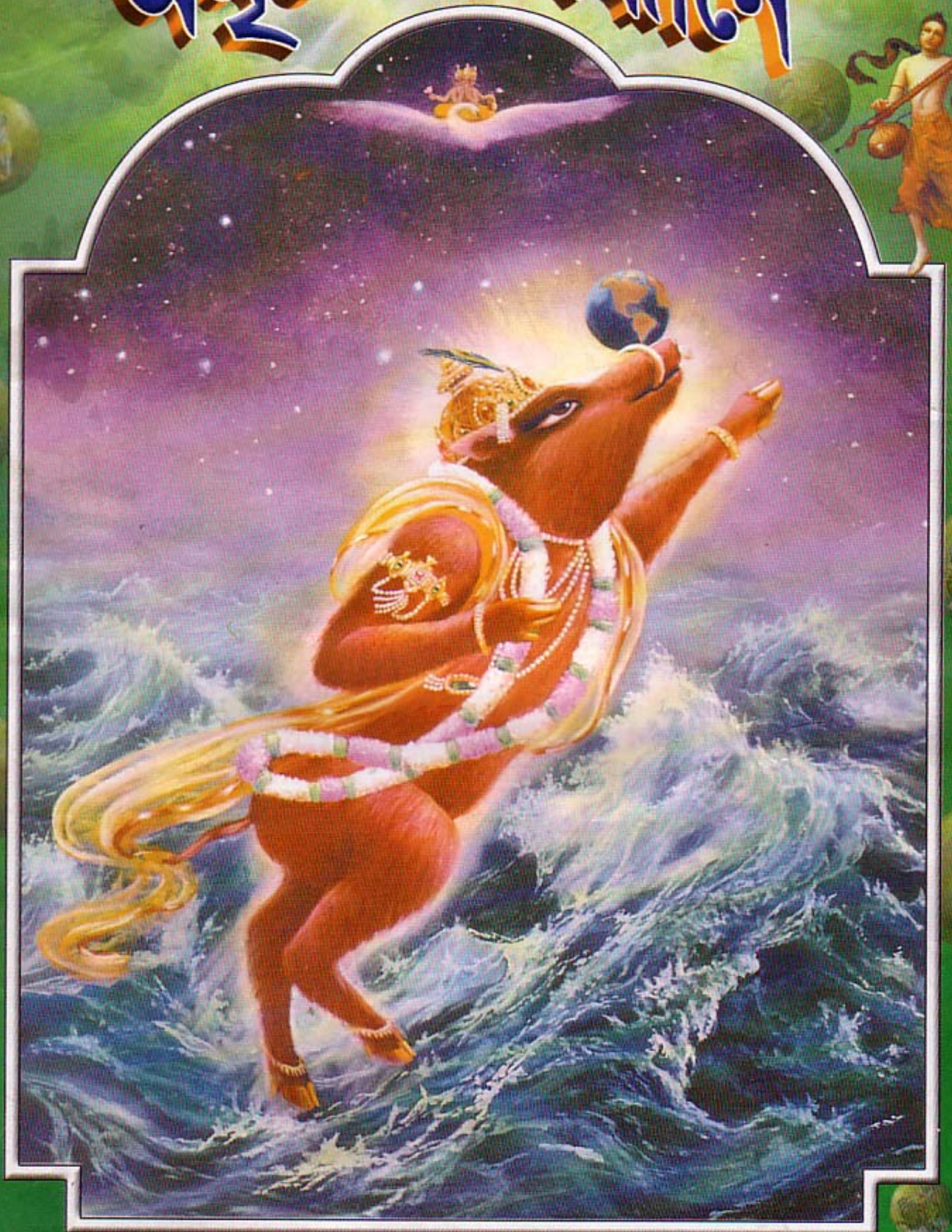
অমৃতের সন্ধানে

ইস্‌কনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র
(কেবলমাত্র সদস্যদের জন্য)

দশম বর্ষ ❐ তৃতীয় সংখ্যা ❐ জুলাই ❐ আগষ্ট ❐ সেপ্টেম্বর ২০০৫ ইং

প্রতিষ্ঠাতা ঃ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ(ইস্‌কন) এর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের নির্দেশানুসারে, বাংলাদেশ ইস্‌কন গভর্নিংবডি কমিশনার ও গুরুবর্গের কৃপায়

সম্পাদক ঃ শ্রী চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী
নির্বাহী সম্পাদক ঃ শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ দাস ব্রহ্মচারী
সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রী অজিতেষ কৃষ্ণ দাস
বাংলাদেশ ইস্‌কন ফুড ফর লাইফ কর্তৃক প্রকাশিত
প্রধান উপদেষ্টা ঃ শ্রী ননী গোপাল সাহা
বিশেষ উপদেষ্টা ঃ শ্রী সত্যরঞ্জন বাড়ৈ, অবসরপ্রাপ্ত ডি আই জি (ভারপ্রাপ্ত)
পৃষ্ঠপোষকতায় ঃ শ্রী চিত্ত রঞ্জন পাল
শ্রী সুদর্শন কৃষ্ণ দাস
স্বত্ত্বাধিকারী ঃ **ইস্‌কন্ ফুড ফর লাইফ**
ভিক্ষা মূল্য ঃ প্রতি কপি- ১৫.০০ টাকা
এবং বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা–
১। সাধারণ ডাকে - ৭০.০০
২। রেজিঃ ডাকে - ৯০.০০
মুদ্রণে ঃ নয়ন গ্রাফিক্, টিপুসুলতান রোড, ঢাকা।
কম্পোজ ঃ কম্পিউটার এন্ড ডিজাইন, শাঁখারী বাজার, ঢাকা।

যোগাযোগ করুন

'ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে'
৭৯, ৭৯/১, স্বামীবাগ রোড,
ঢাকা-১১০০, ফোন ঃ ৭১২২৪৮৮

'ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে'
৫ চন্দ্রমোহন বসাক স্ট্রীট,
বনগ্রাম (ওয়ারী) ঢাকা-১২০৩
ফোন ঃ ৭১১৬২৪৯

প্রচ্ছদ পট

পরমেশ্বর ভগবান এক সুবিশাল বরাহের রূপে অবতীর্ন হয়ে গর্ভোদক সাগরে পতিত পৃথিবীকে তাঁর দন্তের অগ্রভাগে ধারন করে উত্তোলন করলেন।

বসতি দশন-শিখরে ধরনী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃত-শূকররূপ জয় জগদীশ হরে।।

হে কেশব! আপনি যখন শূকরমূর্তি ধারণ করেছিলেন, তখন চন্দ্রের কলঙ্ক-রেখার ন্যায় আপনার দন্তাগ্রে এই পৃথিবী সংলগ্ন ছিল। হে শূকররূপী জগদীশ! হে হরে! আপনার জয় হোক।

বৈষ্ণব পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ঃ ৫১৯ ; বঙ্গাব্দ ঃ ১৪১১-১৪১২ ; খ্রীষ্টাব্দ ঃ ২০০৫-২০০৬

১লা জুলাই ২০০৫, ১৭ আষাঢ় শুক্রবার ঃ শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোভাব।

২রা জুলাই ২০০৫, ১৮ আষাঢ় শনিবার ঃ যোগিনী একাদশীর উপবাস।

৩রা জুলাই ২০০৫, ১৯ আষাঢ় রবিবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ণ ৪.৫৫ মিঃ থেকে ৯.২৫ মিঃ মধ্যে।

৬ই জুলাই ২০০৫, ২০ আষাঢ় বুধবার ঃ শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের তিরোভাব। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব। (দুপুর পর্যন্ত উপবাস)।

৭ই জুলাই ২০০৫, ২১ আষাঢ় বৃহস্পতিবার ঃ গুণ্ডিচা মন্দির মার্জন।

৮ই জুলাই ২০০৫, ২২ আষাঢ় শুক্রবার ঃ ভগবান শ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা। শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর তিরোভাব। শ্রীল শিবানন্দ সেনের তিরোভাব।

১৬ই জুলাই ২০০৫, ১ শ্রাবণ শনিবার ঃ উল্টো রথ। কারকা সংক্রান্তি।

১৮ই জুলাই ২০০৫, ৩ শ্রাবণ সোমবার ঃ শয়ন একাদশীর উপবাস।

১৯শে জুলাই ২০০৫, ৪ শ্রাবণ মঙ্গলবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ণ ৫.০১ মিঃ থেকে ৯.২৯ মিঃ মধ্যে।

২১শে জুলাই ২০০৫, ৬ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ঃ গুরু (ব্যাস পূর্ণিমা), শ্রীল সনাতন গোস্বামীর তিরোভাব। চার্তুমাস্য ব্রত আরম্ভ। (এক মাসের জন্য শাক বর্জন)।

৩১শে জুলাই ২০০৫, ১৬ শ্রাবণ রবিবার ঃ কামিকা একাদশীর উপবাস।

১লা আগস্ট ২০০৫, ১৭ শ্রাবণ সোমবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ণ ৬.১৬ মিঃ থেকে ৯.৩১ মিঃ মধ্যে।

৯ই আগস্ট ২০০৫, ৩০ শ্রাবণ মঙ্গলবার ঃ শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের তিরোভাব। শ্রীল বংশীদাস বাবাজীর তিরোভাব।

১৬ই আগস্ট ২০০৫, ১লা ভাদ্র মঙ্গলবার ঃ পবিত্রারোপণ একাদশীর উপবাস, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলন যাত্রা আরম্ভ।

১৭ই আগস্ট ২০০৫, ২রা ভাদ্র বুধবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ণ ৫.১৩ মিঃ থেকে ৯.৩২ মিঃ মধ্যে। শ্রীল রূপগোস্বামীর তিরোভাব। শ্রীল গৌরী দাস পণ্ডিতের তিরোভাব।

১৯শে আগস্ট ২০০৫, ৪ঠা ভাদ্র শুক্রবার ঃ ঝুলনযাত্রা সমাপ্ত। শ্রীশ্রীবলরামের আবির্ভাব। দুপুর পর্যন্ত উপবাস। চাতুর্মাস্যের দ্বিতীয় মাস শুরু। একমাস দধি বর্জন।

২৭শে আগস্ট ২০০৫ ১৩ ভাদ্র শনিবার ঃ শ্রীকৃষ্ণের জন্মষ্টমী। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত নির্জলা উপবাস। তারপর অনুকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

২৮শে আগস্ট ২০০৫ ১৪ ভাদ্র রবিবার ঃ শ্রীনন্দোৎসব। শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

৩০শে আগস্ট ২০০৫, ১৫ ভাদ্র মঙ্গলবার ঃ অন্নদা একাদশীর উপবাস।

৩১শে আগস্ট ২০০৫, ১৬ ভাদ্র বুধবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ণ ৫.১৮ মিঃ থেকে ৯.৩১ মিঃ মধ্যে।

৯ই সেপ্টেম্বর ২০০৫, ২৫ ভাদ্র শুক্রবার ঃ শ্রীঅদ্বৈতপত্নী সীতাদেবীর আবির্ভাব। শ্রীললিতা দেবীর আবির্ভাব।

১২ই সেপ্টেম্বর ২০০৫, ২৮ ভাদ্র সোমবার ঃ শ্রীমতী রাধারাণীর আবির্ভাব। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

১৪ই সেপ্টেম্বর ২০০৫, ৩০ ভাদ্র বুধবার ঃ পার্শ্বৈকাদশীর উপবাস। দুপুরের পর অনুকল্প।

১৫ই সেপ্টেম্বর ২০০৫, ১লা আশ্বিন বৃহস্পতিবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ণ ৫.২৩ মিঃ থেকে ৯.২৯ মিঃ মধ্যে। ভগবান শ্রীবামন দেবের আবির্ভাব। দুপুর পর্যন্ত একাদশী দিন উপবাস। শ্রীল জীব গোস্বামীর আবির্ভাব মহোৎসব।

১৬ই সেপ্টেম্বর ২০০৫, ২রা আশ্বিন শুক্রবার ঃ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

১৭ই সেপ্টেম্বর ২০০৫, ৩রা আশ্বিন শনিবার ঃ শ্রীঅনন্ত চতুর্দশী ব্রত। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব। শ্রীল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের আবির্ভাব। (শ্রীব্যাসপূজা)।

১৮ই সেপ্টেম্বর ২০০৫, ৪ঠা আশ্বিন রবিবার ঃ বিশ্বরূপ মহোৎসব। শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাস গ্রহণ। চাতুর্মাস্যের তৃতীয় মাস শুরু। এক মাস দুধ বর্জন। শ্রীল প্রভুপাদের আমেরিকায় পদার্পণ।

২৯শে সেপ্টেম্বর ২০০৫, ১৪ আশ্বিন বৃহস্পতিবার ঃ ইন্দিরা একাদশীর উপবাস।

৩০শে সেপ্টেম্বর ২০০৫ , ১৫ আশ্বিন শুক্রবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ণ ৫.২৮ মিঃ থেকে ৯.২৭ মিঃ মধ্যে।

১০শে অক্টোবর ২০০৫, ২৫ আশ্বিন সোমবার ঃ শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা।

১৩ই অক্টোবর ২০০৫, ২৮ আশ্বিন বৃহস্পতিবার ঃ শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব। শ্রীপাদ মধ্বাচার্যের আবির্ভাব।

১৪ই অক্টোবর ২০০৫, ২৯ আশ্বিন শুক্রবার ঃ পাশাঙ্কুশা একাদশীর উপবাস। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর তিরোভাব। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব।

১৫ই অক্টোবর ২০০৫, ৩০ আশ্বিন শনিবার ঃ একদশীর পারণ পূর্বাহ্ণ ৫.৩৪ মিঃ থেকে ৯.২৬ মিঃ মধ্যে।

১৭ই অক্টোবর ২০০৫, ২ কার্তিক সোমবার ঃ শ্রীকৃষ্ণের শারদীয়া রাসযাত্রা। লক্ষ্মী পূজা। চাতুর্মাস্যের চতুর্থ মাস শুরু। একমাস মাষকলাই ও সরিষার তৈল বর্জন। শ্রীল মুরারিগুপ্তের তিরোভাব।

২২শে অক্টোবর ২০০৫, ৭ কার্তিক শনিবার ঃ শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের তিরোভাব।

২৮শে অক্টোবর ২০০৫, ১৩ কার্তিক শুক্রবার ঃ পরমা একাদশীর উপবাস।

২৯শে অক্টোবর ২০০৫, শনিবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ণ ৫.৪১ মিঃ থেকে ৯.২৭ মিঃ মধ্যে।

৩রা নভেম্বর ২০০৫, ১৯ কার্তিক বৃহস্পতিবার ঃ শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজা, গো-পূজা ও গো-ক্রীড়া। বলিদৈত্যরাজ পূজা। শ্রীল রসিকানন্দের আবির্ভাব। শ্রীল বাসুদেব ঘোষের তিরোভাব।

৫ই নভেম্বর ২০০৫, ২১ কার্তিক শনিবার ঃ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের তিরোভাব। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

৯ই নভেম্বর ২০০৫, ২৫ কার্তিক বুধবার ঃ শ্রীগোপাষ্টমী ও গোষ্ঠাষ্টমী। শ্রীল গদাধর দাস গোস্বামী, শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিতের এবং শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর তিরোভাব। শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী পূজা।

১২ই নভেম্বর ২০০৫, ২৮ কার্তিক শনিবার ঃ শ্রীল গৌর কিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব। শ্রীভীষ্মপঞ্চক শুরু (৫ দিন)। দুপুর পর্যন্ত উপবাস। এবং উত্থান একাদশীর উপবাস।

মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্য ক্ষয়। মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়॥

'শ্রীহরির সন্তুষ্ঠি বিধানই ধর্ম'

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা- আচার্য

২৪ অক্টোবর, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বৃন্দাবনে শ্রীমদ্ভাগবত (১/২/১৩) প্রবচন থেকে সংকলিত

প্রদ্যুম্ন ঃ অনুবাদ ঃ "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, বর্ণাশ্রম বিভাগ বা জীবন বিন্যাস অনুসারে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সর্বোচ্চ পূর্ণতা লাভ করতে হলে বিধিবদ্ধ কাজ বা ধর্ম সম্পাদনের দ্বারা ভগবান শ্রীহরিকে তুষ্ট করতে হবে।"

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ **অতঃ পুম্ভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠ বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।** বর্ণ ও আশ্রম। মনুষ্য সমাজে এই বর্ণাশ্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্ণাশ্রমের আদর্শ গ্রহণ না করলে সেই সমাজ পশুসমাজ তুল্য। সেটা মনুষ্য সমাজ নয়। চতুর্বর্ণ-ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, সমাজের এই চারটি বিভাগ, এবং চারটি আশ্রম হল- ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। এটা বৈদিক সংস্কৃতি, বর্ণ ও আশ্রম। মানব সমাজে এটা গৃহীত নয়। বিষ্ণুপুরাণেও বলা হয়েছে,

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমাণ্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্ ॥

সারা জীবনের লক্ষ্য হল বিষ্ণুর অনুকম্পা লাভ। ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্। এটা ঋক্-বেদ মন্ত্র। বিষ্ণু সমীপে পৌছানোর মন্ত্র। কিন্তু তারা জীবনের লক্ষ্য জানে না। **ন তে বিদুঃ সর্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্।** তারা জানে না সমাজ জীবনের লক্ষ্য কি, তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান সময়ে গোটা মানবসমাজ তার লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছে। জড় সমন্বয় সাধনের দ্বারা তারা সুখী হতে চেষ্টা করছে। সামাজিক বিন্যাসের দ্বারা, রাজনৈতিক বিন্যাসের দ্বারা, অর্থনৈতিক বিন্যাসের দ্বারা, অথবা ধর্মীয় বিন্যাসের দ্বারা, তারা গোটা মানব সমাজকে সুখী করতে চেষ্টা করছে, কিন্তু ভাগবত বলছেন, **দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।** এটা এমন কিছু, যেটা আশা পুরণের বাইরে। কখনই এই আকাঙ্খা পূর্ণ হবে না। কারণ, তারা পরমেশ্বর ভগবানের বহিঃশক্তিকে গ্রহণ করেছে।

ঠিক এই দেহের মতো। তোমার দেহ, আমার দেহ, এ সবই বহিরর্থ, বাহ্যিক। ঠিক আমার এই শালের মতো। এই গাত্রাবরণী একটি বাহ্যিক বস্তু। আসল ব্যক্তি হল আত্মা। আত্মার মূল বিষ্ণু সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। তারা শুধু বহিরঙ্গ নিয়েই ব্যস্ত। একেই বলে বহিরর্থ। বহিঃ অর্থ বাহ্যিক। অর্থ মানে স্বার্থ। আমাদের ভাগবতে তোমরা একটা ছবি দেখেছ, একজন মহিলা শুধু খাঁচার যত্ন করছে, ভিতরের পাখিটা কিন্তু অযত্নে মরতে বসেছে। এদের ব্যাপারও তেমনি। বহিরর্থমানী বলতে বোঝাচ্ছে, আমরা শুধু বাইরে দেহটার যত্ন করছি, ভিতরের পাখিরূপ আত্মাটার কোন যত্ন করছিনা। এটা গরু-গাধার সভ্যতা। স এব গো-খরঃ। গো মানে গরু এবং খর মানে গর্দভ। তাই এখানে বলা হয়েছে, **অতঃ পুম্ভির্দ্বিজ-শ্রেষ্ঠঃ।।**

দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ। নৈমিষারণ্যের সেই সভায় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের দ্বিজ বলে ধরা হয়। পিতা-মাতার দ্বারা এক জন্ম, গুরু ও বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা অন্য জন্ম। গুরু হলেন পিতা এবং বৈদিক জ্ঞান হল মাতা। এটা আর্যসভ্যতার অন্তর্গত। শূদ্রেরা হল একজন্মা। দ্বিজত্ব-জনিত কোন অনুষ্ঠান এদের নেই। অথবা বলা যেতে পারে যারা দু'বার জন্মায় না, তারা হল শূদ্র। উপবীত ধারণ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত না হলেই শূদ্র। বস্তুত, বর্তমানে ভারতেও এইসব অনুষ্ঠান এখন গৃহীত হয় না, বা কেউ এখন এর পরোয়া করে না। অন্যান্য দেশের কথাতো ছাড়্। অতএব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হল, **কলৌ শূদ্রসম্ভবাঃ।** এই কলিযুগে শুধুই শূদ্র। বস্তুতপক্ষে, এই যুগে কোন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং কোন বৈশ্য নেই। কিছু বৈশ্য হয়তো থাকতে পারে। কিন্তু অবস্থাটা হল এই।

এখানে বলা হয়েছে, **বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।** কোন ব্যক্তি বা কোন সমাজ যদি এই চার বর্ণ ও আশ্রম গ্রহণের জন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বা বিধিবদ্ধ নিয়মের অধীনে না আসে, তবে সেই ব্যক্তি বা সমাজকে মানব সমাজ বলা যায় না। মানব-সমাজেই ভগবানের উপলব্ধি হয়, পশু-সমাজে নয়। বর্ণাশ্রমের প্রতিষ্ঠান যেহেতু উঠে গেছে, তাই লোকেরা এখন অধার্মিক নাস্তিকে পরিণত হয়েছে। বর্ণাশ্রম অর্থ হল একটি প্রতিষ্ঠান বা সমাজের এমন একটি বিন্যাস, যেখানে কারও বিষ্ণু সম্বন্ধে ক্রমে উপলব্ধি হয় এবং সে বিষ্ণু পূজা করে। বিষ্ণুরারাধ্যতে। এটাই পদ্ধতি। সেই সব তথাকথিত ব্রাহ্মণ ও তথাকথিত ক্ষত্রিয়েরা নয়। তাদের বিষ্ণু সম্বন্ধে কোন

ধারণা নেই, আর সেইজন্যই তারা ঘোষণা করে, "আমি ব্রাহ্মণ," "আমি ক্ষত্রিয়।" শাস্ত্র অনুযায়ী তাদের বলা হয়, ব্রহ্ম-বন্ধু, দ্বিজ-বন্ধু। যারা ব্রাহ্মণ-পরিবারে বা ক্ষত্রিয় পরিবারে অথবা বৈশ্য পরিবারে জন্ম নিলেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মতো কাজ করে না, তাদের বলা দ্বিজ-বন্ধু। তাদের দ্বিজ বলে ধরা হয় না। **স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজ-বন্ধুনাং ত্রয়ী না শ্রুতিগোচরা।**

এই উদ্দেশ্যেই ব্যাসদেব কর্তৃক মহাভারত বিরচিত হয়েছিল। কারণ, স্ত্রী, নারী, শূদ্র, সমাজের চতুর্থ-শ্রেণী বা কর্মী-শ্রেণী, এবং যারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মেও তাদের মতো কাজ করে না তারা দ্বিজ-বন্ধু। এদের জন্যই মহাভারত রচিত। একে 'পঞ্চম বেদ' বলা হয়। চারটি বেদ হল ঃ ঋক,সাম,যজুঃ ও অথর্ব। অল্পবুদ্ধির লোকেরা অর্থাৎ স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজ-বন্ধুরা বৈদিক ভাষা বুঝতে পারে না।

ভগবদ্‌গীতায়ও বলা হয়েছে,

মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিতা যেহপিস্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

সুতরাং কেউ যদি কৃষ্ণ ভক্ত হয়, তখন সে স্ত্রী বা শূদ্র বা দ্বিজ-বন্ধু, সেটা কোন ব্যাপার নয়। **তেহপি যান্তি পরাং গতিম্**। তারাও তখন পূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পারে।

এটা হল কৃষ্ণের বিশেষ অনুকম্পা। সাধারণভাবে, এটাই সূত্র। কি সেটা? **অতঃ পুম্ভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠ বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ**। বর্ণাশ্রম বিভাগের উপর এটা নির্ভরশীল। **স্বণুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্**। প্রত্যেকেরই পূর্ণতা থাকতে হবে। কিন্তু লোকেরা জীবনের পূর্ণতা নিয়ে আগ্রহী নয়। তারা জানেও না পূর্ণতার কি অবস্থা। পূর্ণতা হল হরি-তোষণম্, লীলা পুরুষোত্তমের সন্তুষ্টি বিধান করা । তুমি কে বা কি তাতে কিছু যায় আসে না। তুমি ব্রাহ্মণ হলে, তোমার কাজের দ্বারা, **সত্যং শমো দমোস্তিতিক্ষা** তোমার কঠোর আত্মসংযম ও জ্ঞানের দ্বারা তুমি শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করতে পার। কৃষ্ণ ও বিষ্ণু একই। কৃষ্ণ বিষ্ণু-তত্ত্বের মূল। **অহং সর্বস্য প্রভবঃ**। কৃষ্ণ বলছেন, তিনি বিষ্ণুর উৎসমূল। কারণ এই সৃষ্টিকার্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হলেন মূল, সৃষ্টির আসল দেবদেবীদের উৎস। ব্রহ্মা হলেন সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা এবং মহেশ্বর মহাদেব অথবা ভগবান শিব হলেন সংহার কর্তা। এই তিন বিগ্রহ হলেন তিনটি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্তা। তাই কৃষ্ণ বলছেন, **অহং সর্বস্য প্রভবঃ**। তার মানে কৃষ্ণ হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের মূল। **অহং সর্বস্য প্রভবঃ, মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে**। অতএব এখানে তাই বলা হয়েছে, **হরিতোষণম্**। আমরা যদি পরমেশ্বর ভগবান হরিকে তুষ্ট করি,তবে সকলকেই তুষ্ট করা হবে। কারণ সবকিছুই তাঁর অন্তর্গত। **সর্বস্য প্রভবঃ** অন্য সব দেবদেবীকে আর পৃথকভাবে তুষ্ট করতে হবে না। তার কোন প্রয়োজন নেই।

প্রদত্ত উদাহরন হলঃ যথা, **তরোর্মূলনিষেচনের তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ**। বৃক্ষের মূলে যদি জল ঢালা যায়, তবে আপনা থেকেই তার শাখা-প্রশাখা, কাণ্ড, পত্র, পুষ্প সব কিছুকেই জল সিঞ্চন করা হয়। এটাই পন্থা। **প্রানোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাম্**। পাকস্থলীতে যদি খাদ্য প্রেরণ করা হয়, তবে আপনা থেকেই শরীরের বিভিন্ন অংশে শক্তি বিতরিত হয়। এজন্য চোখ, কান,নাককে পৃথকভাবে খাদ্য সরবরাহ করতে হয় না। শুধু পাকস্থলীতে খাদ্য চালান করলেই শক্তির বন্টন হয়ে থাকে। তেমনি, **সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্**। তুমি যদি পরমেশ্বর ভগবান হরিকে তুষ্ট কর, তবে সকল দেবতাই তুষ্ট হবেন। তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টঃ। মহাভারতের সেই গল্পটি তোমরা জান ঃ একদা দুর্যোধন পরিকল্পনা মাফিক দুর্বাসা মুনিকে খুব ভালভাবে তুষ্ট করেছিলেন এবং দুর্বাসা মুনিও তুষ্ট হয়ে তাকে বর দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্যোধন খুব ধূর্ত ছিল। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পাণ্ডবদের প্রতারণা করা। তাই সে বলল, "ভগবান, আমি অন্য কোনদিন বরটি চেয়ে নেব। এখন নয়।" মুনি বললেন, "তাই হবে।" সুতরাং পাণ্ডবেরা যখন বনবাসে ছিলেন, দুর্যোধন তখন তাদের উত্যক্ত করতে ফন্দি আটল। সে তখন দুর্বাসা মুনির কাছে গিয়ে হাজির হল, "হে ব্রাহ্মণ, আপনি আমাকে বর দিতে চেয়েছিলেন। সেইজন্য আমি এখন আপনার কাছে এসেছি। পাণ্ডবেরা এক্ষণে ভ্রাতৃগণের সঙ্গে বনে বাস করছেন, অতএব আপনি আপনার দশ-সহস্র শিষ্যপরিবৃত হয়ে তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করুন। যে সময়ে দ্রোপদী ভোজন পর্ব সম্পন্ন করে বিশ্রাম করবেন তখন আপনি সেখানে যাবেন। এইভাবে আপনি আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করুন।" সুতরাং মুনিবর একদিন বনে পাণ্ডব বসতিতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ক্ষত্রিয়দের কাজ হল ব্রাহ্মণ অতিথিদের সাদরে গ্রহণ করা। তারা তো অতিথিদের অবজ্ঞা করতে পারেন না। তাই পাণ্ডব অগ্রজ যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, "হে মহাত্মন আতিথ্য গ্রহণ করুন। শীঘ্র স্নান কার্য সম্পন্ন করুন, আপনাদের যথাবিহিত ব্যবস্থা করছি।" কিন্তু বনে কি ব্যবস্থা তাঁরা করবেন ? কাজেই তাঁরা বিমূঢ়ের ন্যায় বসে রইলেন।

সুতরাং কৃষ্ণ, **কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি**...কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা হল তাঁর ভক্তরা সর্বদা সুরক্ষিত আছে কিনা তা দেখা। তাই তাঁরা যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেন, তখন কৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন। কৃষ্ণ বললেন, "সমস্যাটা কি ?" তাঁরা বললেন, "এই তো সমস্যা।" তখন দৌপদীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ভোজন শেষ হয়ে গেছে ? দ্রৌপদীর একটা বর ছিল যে যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি অনাহারী থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত যতলোকই আসুক না কেন তিনি তাদের ভোজন করাতে সক্ষম হবেন। এটাই ছিল তাঁর বরের ক্ষমতা। কিন্তু এক্ষনে তিনি আহারকার্য সম্পূর্ণ করেছেন। তখন কৃষ্ণ বললেন, "যাও পাকশালে গিয়ে দেখ কোথায় সামান্য কিছু খাদ্য অবশিষ্ট আছে কিনা। তারা বললেন, "না, কোথাও কিছু নেই। সব শেষ হয়ে গেছে। কোন খাদ্যবস্তুই নেই।" কৃষ্ণ বললেন, "যাও না, চেষ্টা করেই দেখ।" তখন তাঁরা গিয়ে দেখলেন একটি পাত্রের কানায় কিঞ্চিৎ শাকান্ন লেগে আছে। তাঁরা তাই নিয়ে এলেন এবং কৃষ্ণ সেটুকুই তৎক্ষণাৎ ভোজন করলেন। কৃষ্ণের ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে দুর্বাসা মুনি ও তাঁর শিষ্যরা অনুভব করলেন যে তাঁদের উদর পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টঃ। তখন তাঁরা লজ্জিত হলেন

এই ভেবে যে "কি করে আমরা যাব ? আমরা তো কিছুই খেতে পারব না।" অতএব তাঁরা গঙ্গা থেকেই পালিয়ে গেলেন।

সুতরাং প্রকৃত পদ্ধতি হল এই। কৃষ্ণকে তুষ্ট করতে পারলেই, এবং কৃষ্ণ যদি বলেন, "ঠিক আছে।" তবে সব কিছুই ঠিক। ব্যাস্। এই হল কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন। যে কোন প্রকারেই হোক কৃষ্ণকে তুষ্ট কর। **সংসিদ্ধিহরিতোষণম্‌**। তাহলে সব কিছু পূর্ণ হবে। খুবই সহজ পদ্ধতি। কৃষ্ণকে তুষ্ট করতে চেষ্টা করলেই তোমাদের সব কিছু তুষ্ট হবে, সবকিছু পূর্ণ হবে। কৃষ্ণও তাই বলছেন। কৃষ্ণ এত দয়ালু যে তাঁকে তুষ্ট করা কঠিন কিছু নয়। তিনি বলছেন, **পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি**। কৃষ্ণ বলছেন, "তোমরা আমাকে ভোজন করাতে ইচ্ছুক, সেটাই যথেষ্ট। সামান্য ফল-ফুল যা কিছু তোমাদের আছে বা যে কোন একটি বস্তু আমাকে অর্পন কর, তাতেই হবে।" আসল জিনিষ হল ভক্তি, প্রেম। কৃষ্ণ এমন বলছেন না যে, প্রচুর লুচি, পুরি, কচুরি, হালুয়া তাঁকে দিতে হবে। না, কৃষ্ণ তা চাচ্ছেন না। তিনি শুধু তোমাদের প্রেম চান। পিতা যেমন গোটা পরিবারের দায়িত্ব নেন তেমনি। তিনি পরিবার প্রতিপালন করতে রাতদিন পরিশ্রম করেন। তিনি শুধু তার স্ত্রী-পুত্রদের কাছ থেকে ভালবাসা আশা করেন। অর্থনৈতিক উন্নতির এটাই প্রেরণা। না হলে শুধু নিজের ভোগের জন্য হাজার হাজার, লাখ লাখ রোজগার করেন না। তিনি নিজে হয়তো বড়জোড় চারটি চাপাটি খাবেন। যার মূল্য ছয় আনা পয়সা। তাঁর এই কঠোর পরিশ্রম শুধু স্ত্রী-পুত্রদের সন্তুষ্টি ও ভালোবাসার জন্য। কর্মক্ষেত্র থেকে বাড়িতে এসে তিনি তাদের হাসি-খুশি মুখ দেখবেন-এটাই আশা।

তেমনি কৃষ্ণও এই পরিবার বিস্তৃত করেছেন। **বহুস্যাম্‌**। তিনি বহু জীব হয়েছেন। অভিপ্রায়টি কি ? একং **আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ**। কারণ, তিনি আনন্দময়। তিনি জীবের সঙ্গে ভালবাসা-বিনিময় উপভোগ করতে চান। তাঁর অভিপ্রায় এটাই। না হলে কেন তিনি জীব সৃষ্টি করেছেন ? তিনি ভালবাসা চান বলেই। কিন্তু এই সব মুর্খেরা সে-সব ভুলে গেছে। তারা বলছে, "ভগবান নেই। আমিই ভগবান। আমিই উপভোক্তা।" ভগবানকে ভালবাসার বদলে নিজেরাই ভগবান সেজে বসেছে। এই মনোভাব গোটা পরিস্থিতিটাই নষ্ট করে দিয়েছে। কাজেই কৃষ্ণ আবির্ভূত হন এবং ভালবাসার পারস্পরিক বিনিময় প্রক্রিয়া পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে চান, আর একেই বলে ভক্তি। তুমি কৃষ্ণকে ভালবাস এবং কৃষ্ণ তোমাকে ভালবাসেন। তোমার ভালোবাসা ছাড়াও কৃষ্ণ তোমাকে ভালবাসেন। তা-না হলে কি করে তোমার আহারাদি চলছে ? কৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত তুমি এক মুহূর্তও বাঁচতে পার না কেন ? এটা প্রকৃত সত্য। **একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান**। একারণেই কৃষ্ণের আগমন।

কৃষ্ণ বলছেন, **ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে** এটাই তো প্রকৃত ধর্ম। ধর্মের অর্থ **ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবতপ্রণীতম্‌**। ভগবানের উপভোগ্য বস্তুই ধর্ম। ভগবান কথিত বস্তুই ধর্ম। ভগবান বলছেন, "এটা কর।" সেটাই ধর্ম। এমন নয় যে তোমার ধর্মকে তুমি তৈরী কর। ভগবান বলছেন, কৃষ্ণ বলছেন, **মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং**...এটাই ধর্ম। এর বাইরে যা কিছু সব বাজে অর্থহীন বস্তু। সে-সব ধর্ম নয়। **ধর্মঃ কৈতবঃ**। প্রবঞ্চনা, শুধুমাত্র প্রবঞ্চনা। ভাগবতে বলা হচ্ছে, **ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতঃ কৈতবোঽত্র**-এই সব ইতরামির ধর্ম লাথি মেরে ছুড়ে ফেলে দাও।" **ধর্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতম্‌**। এটাই ধর্ম।

সেই একই বস্তুই এখানে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। **স্বনুষ্ঠিতম্ ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্‌**। তোমরা ধর্মপরায়ণ, সে ঠিক আছে, কিন্তু ধর্মের উদ্দেশ্য হল পরম পুরুষ ভগবানকে তুষ্ট করা। সেটাই পরিপূর্ণতা এটা কোন ব্যাপার নয়। কারণ বলা হয়েছে, **বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ**। ব্রাহ্মণবর্ণের লোকেরা তপস্যার দ্বারা সত্যবাদিতা দ্বারা, তাঁদের শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা সহজেই শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করতে পারেন। তাঁরা বিশ্বে-শাস্ত্র জ্ঞান প্রচার করতে পারেন। ভগবানের হয়ে ব্রাহ্মণেরা ভোজন করতে পারেন। তাই বৈদিক সভ্যতা অনুযায়ী ব্রাহ্মণ-ভোজনের একটি প্রথা আছে। ব্রাহ্মণ-ভোজনের অর্থ ব্রাহ্মণেরা যা ভোজন করেন ব্রাহ্মণের মাধ্যমে সে সমস্তই ভগবান কৃষ্ণ গ্রহণ করেন। বৈদিক সভ্যতায় দরিদ্র-ভোজন বলে কোন কথা নেই। এখন লোকেরা শরণার্থী-ভোজন, দরিদ্র ভোজন ইত্যাদি প্রথার প্রচলন করেছে। প্রকৃত ব্রাহ্মণকে যা কিছু ভোজন করানো হয়, সবই কৃষ্ণ-ভোজনের সামিল। এটাই **সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্‌**।

অর্জুন ক্ষত্রিয় ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন না। সন্ন্যাসীও ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন গৃহস্থ রাজা। তাঁর কাজ ছিল দেশ রক্ষা করা। তিনি জানতেন যুদ্ধ করতে ও হত্যা করতে এবং এই হত্যা-কার্যের মাধ্যমেই তিনি

কৃষ্ণকে তুষ্ট করতেন। **সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্**। ভগবদ্গীতার অখণ্ড উদ্দেশ্য হল এটাই। অর্জুন হত্যাকার্যে বিমুখ ছিলেন, আর কৃষ্ণ তাঁকে হত্যা করতে প্ররোচিত করছেন, "তোমাকে অবশ্যই শত্রু নিধন করতে হবে।" আর যখন তিনি নিধনকার্যে সম্মত হয়েছেন, তখন কৃষ্ণ পরিতুষ্ট হয়েছেন। তিনি তখন পরিপূর্ণ। এগুলি হল প্রমাণ। কৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধানই হল, উদ্দেশ্য। অর্জুন যখন যুদ্ধ করতে অসম্মত হয়েছিলেন, তখন সেটা ছিল অর্জুনের আত্ম-তুষ্টি। "আমি আমার পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য, মাতুল, ভ্রাতা, শ্বশুর, মিত্র ও শুভাকাঙ্খীদের হত্যা করতে পারি না। তাঁদের বিয়োগে আমি সুখী হতে পারব না। তাই তাঁদের হত্যা করে কি লাভ?" এগুলি সব ইন্দ্রিয় তৃপ্তি, তথাকথিত অহিংসা। ভক্ত কখনও হিংসা-অহিংসা বোঝেন না। তাঁর একান্ত বাসনা কৃষ্ণ-তুষ্টি। তাঁরা নশ্বরতা ও অবিনশ্বরতা জানেন না। গোপীদের মতো তাদের একান্ত কামনা-কৃষ্ণের সন্তোষ। গোপীদের মতো নিশুতি রাতে কৃষ্ণ অভিসারে যেতে তাঁরা আগ্রহী। **সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্**।

কাজেই যে কোন অবস্থাতেই যে কেউ থাকুক না কেন, সেটা কোন ঘটনা নয়। প্রত্যেকেরই কৃষ্ণ-তুষ্টির চেষ্টা করতে হবে। **মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু**। জীবনের পূর্ণতা তো এটাই। সর্বদা কৃষ্ণ-চিন্তা কর-**মন্মনাঃ**। "সদা আমার ভক্ত হও"-মদ্ভক্ত। "সদা আমার পূজা কর"-মদ্‌যাজী। "সদা আমাকে নমস্কার কর"-মাং **নমস্কুরু**। "কিন্তু আমার অন্য ধর্মও আছে। ভগবান, তাই শুধু তোমার চিন্তা আমি কিভাবে করব? দেবী-কালিকার চিন্তাও আমাকে করতে হয়। না হলে আমার মাংসাহার করা হবে না।" সেইজন্য কৃষ্ণ বলছেন, **সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং**..."এ সব অর্থহীন। এসব ত্যাগ কর।" শুধু আমার শরণাপন্ন হও। অন্যকোন দেব-দেবী নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তারা সবাই আমার সেবক। তোমাকে আমার সেবকদের সন্তুষ্ট করার প্রয়োজন নেই।" অবশ্য প্রকৃত সেবক হলে ভিন্ন কথা।

সুতরাং প্রকৃত ধর্ম হল, **সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্**। অর্জুন যেমন হত্যার দ্বারা কৃষ্ণকে তুষ্ট করেছিলেন, তোমরাও তেমনি যেভাবেই হোক কৃষ্ণকে তুষ্ট কর। হত্যালীলা মোটেই ভাল কাজ নয়, হত্যার দ্বারা যদি কৃষ্ণের পরিতোষণ হয়, তবে তাই করতে হবে। যুদ্ধ করে, হত্যা করে অর্জুন কৃষ্ণকে তুষ্ট করেছিলেন, কৃষ্ণও তাই অর্জুনের প্রশংসা করেছিলেন, **ভক্তোহসি প্রিয়োহসি মে**, "হে অর্জুন, তুমি আমার অতি প্রিয় সখা।" কৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল অসুর নিধন করা, **পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্**। তাই অসুর নিধনে অর্জুন কৃষ্ণকে সাহায্য করে কৃষ্ণের অভিলাষ পূরণ করেছিলেন। আর সেই জন্য হত্যার দ্বারাই তিনি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণের বা তাঁর প্রতিভূর অনুমোদিত কিছু করাটাই প্রকৃত ধর্ম। **সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্**। অশেষ ধন্যবাদ। হরেকৃষ্ণ।

(৩২ পৃষ্ঠার পর)

মানুষদের কাকের সঙ্গে তুলনা করা হয়, আর সর্বতোভাবে পারমার্থিক স্তরে অধিষ্ঠিত সন্ত পুরুষদের হংসের সাথে তুলনা করা হয়। যেখানে আবর্জনা ফেলা হয় কাকেরা সেখানে সুখে সমবেত হয়, ঠিক যেমন বিষয়াসক্ত সকাম কর্মীদের যেখানে সুরা, স্ত্রীলোক এবং স্থুল ইন্দ্রিয় সুখ লাভ হয়, সেই সমস্ত স্থানে আনন্দের অন্বেষণ করে। কাকেরা যেখানে সুখের অন্বেষণে সমবেত হয়, হংসেরা সেখানে আনন্দের অন্বেষণ করে না। পক্ষান্তরে, সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে বিভিন্ন বর্ণের পদ্মফুলের দ্বারা শোভিত নির্মল

সরোবরে তাদের দেখতে পাওয়া যায়। সেটিই হচ্ছে এই দুটি পক্ষীর মধ্যে পার্থক্য।

বিভিন্ন ধরনের জীবকে প্রকৃতি তাদের মনোবৃত্তি অনুসারে প্রভাবিত করে এবং তাদের কখনই সমপর্যায়ভুক্ত করা যায় না। তেমনই, বিভিন্ন ধরনের মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষদের জন্য বিভিন্ন রকমের সাহিত্য রয়েছে। বাজারের যে সমস্ত সাহিত্য কাক সদৃশ মানুষদের আকৃষ্ট করে, তার বিষয়বস্তু হচ্ছে পূতিগন্ধময় ইন্দ্রিয়-সুখভোগের বিষয়। সেগুলি সাধারণত স্থুল দেহ এবং সূক্ষ্ম মন সম্পর্কিত জাগতিক বিষয়। সেগুলি নানা রকম আলঙ্কারিক ভাষায় বর্ণিত পার্থিব দৃষ্টান্ত এবং রূপক সমন্বিত বর্ণনায় পূর্ণ। কিন্তু তা হলেও সেগুলি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা বর্ণনা করে না। এই ধরনের কবিতা এবং রচনা, তা সে যে বিষয়েই হোক না কেন, মৃতদেহকে সাজানোর মতো বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নত মানুষ, যাঁদের হংসের সাথে তুলনা করা হয়েছে, কখনই এই ধরনের মৃত সাহিত্যে আনন্দের অন্বেষণ করেন না, যা হচ্ছে আধ্যাত্মিক বিচারে মৃত মানুষদের সুখভোগের উৎস। এই সমস্ত রাজসিক ও তামসিক সাহিত্যগুলি বিভিন্ন ধরনের ছাপ মেরে বিতরণ করা হয়, কিন্তু তা মানুষের আধ্যাত্মিক আকাঙ্খার সহায়ক হয় না এবং তাই হংস সদৃশ সাধু পুরুষেরা কখনই তা স্পর্শ করে না। পারমার্থিক স্তরে উন্নত এই সব মানুষদের বলা হয় 'মানস'। কেন না তাঁরা সর্বদাই চিন্ময় স্তরে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখেন। তা স্থুল ইন্দ্রিয়সুখ অথবা অহংকারাচ্ছন্ন মনের সূক্ষ্ম জল্পনা-কল্পনা সর্বতোভাবে বর্জন করে।

সামাজিক দিক দিয়ে উচ্চশিক্ষিত মানুষ, বৈজ্ঞানিক, জড় বিষয়ের কবি, দার্শনিক এবং রাজনীতিবিদেরা, যারা কেবল জড় ইন্দ্রিয় সুখভোগের উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টাতেই মগ্ন, তারা হচ্ছে মায়ার হাতের ক্রীড়ানক। যেখানে পরিত্যক্ত বিষয়গুলি ফেলে দেওয়া হয়, সেখানেই তারা আনন্দের অন্বেষণ করে। শ্রীধর স্বামীর মতে, এটি হচ্ছে বেশ্যাসক্তদের সুখ।

কিন্তু যে-সমস্ত সাহিত্য পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা বর্ণনা করে, মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত পরমহংসরা তা আস্বাদন করেন।

– চলবে।

উচ্চস্বরে হরিনাম করুন

– শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

কীর্তন উচ্চস্বরেই বিধেয়। হরিকথা উচ্চস্বরে কীর্তন না করে বাচালতায় পঞ্চমুখ হলে কালসর্পের কবলে কবলিত হতে হয়। হরিকীর্তনে যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ার নিদর্শন আছে, তাহা যাঁরা বুঝতে পারেন না, তাঁদের কেহ কেহ বলে থাকেন,-

'মালা জপে শালা, কর জপে ভাই।
যো আপ্‌না মন্ মন্ জপে, উসকো বলিহারী যাই॥'

হরিকথা উচ্চারণ করিও না, মনে মনে জপ কর, এই উপদেশ প্রদান করায় লোকে কেবল বাজে কথা বলবে, কারণ বাজে কথা বলবার জন্যই লোকে সর্বদা উদ্‌গ্রীব হয়েছে। মহাপ্রভু ইহা নিষেধ করেছেন। মহাপ্রভুর উক্তি **'কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'**, **'নাম-লীলা-গুনাদীনামুচ্চৈর্ভাষনং তু কীর্তনম্'**। যিনি উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করেন তিনি দানবীর, তিনি পরহিংসা করেন না। যিনি মৌনী হয়ে থাকেন, কিন্তু কৃষ্ণকীর্তন করেন না, তাঁহার অব্যক্ত বাগ্‌বেগ নিজের ও পরের অমঙ্গল সাধন করে। তিনি মনে মনে বিষয়চিন্তা করেন, তিনি আত্মহিংসক ও পরহিংসক। তাই মহাপ্রভুর উপদেশ-সর্বদা কীর্তন কর। যাঁরা সেই কীর্তন শ্রবণ করবেন তাঁরা যদি তোমার বন্ধু হয়, তাহা হলে তোমার ভুল কীর্তন সংশোধন করিয়ে দিবেন। আবার অকপটভাবে কীর্তন করতে করতে চৈত্যগুরুও তোমার কীর্তনে ভুল থাকলে তাহা সংশোধিত করবেন। কপটতা ও প্রতিষ্ঠা কামনা হৃদয়ে থাকলে লোকে তথাকথিত মৌনধর্ম অবলম্বন করে। **'বকঃ পরমধার্মিক'**। কপটতা দ্বারা চালিত হয়ে যারা মৌন-ধর্ম অবলম্বন করে তারা অকস্মাৎ কোন পাপ করে বসে। মৌনী ও ধ্যানী হয়ে নিজের স্বার্থ-পোষণের জন্য তারা অপরের দ্রোহ আচরণ করে। কৃষ্ণকথা-কীর্তন না হলে জগতে কুণ্ঠধর্মই অধিকতর প্রবল হবে। দেশ-কাল-পাত্রকে কৃষ্ণের অনুগ্রহ প্রসাদ প্রদান না করে উহাদের প্রতি যদি নির্দয়তা করা হয় তবে তদ্দারা আত্মঘাতী হতে হয়। দুই প্রকার ব্যক্তি কৃষ্ণকীর্তন করেন না, (১) যাঁরা মহামুর্খ-অর্থাৎ মায়াবাদী, অপরাধী, তথাকথিত ধ্যানী, তথাকথিত মৌনী প্রভৃতি, আর (২) যাঁরা প্রকৃত প্রস্তাবে, কৃষ্ণকীর্তন করেন না, অথচ মনে করে থাকেন,- আমরা কৃষ্ণকীর্তন করি।'

হরিকীর্তনব্যতীত আর বাদ বাকী সবই 'কিচির-মিচির' শার্গালা উক্তি মাত্র। কৃষ্ণ-উক্তি ব্যতীত অন্য-উক্তি শ্রবণ-রন্ধ্রে প্রবেশ করান' উচিত নহে। এজন্য শ্রবণ করতে হবে- "গৌরবিহিত শ্রবণ", তাহা হলেই 'গৌর-বিহিত কীর্তন' হবে। মৌনী হলে শ্রবণ ও স্মরণের দ্বারও রুদ্ধ হয়ে যায়। যারা হরিস্মরণকে হেলা করে থাকে, তারাই নির্জনতা-প্রয়াসী ও মৌনী হয়ে শ্রবণ-কীর্তনের পথ রুদ্ধ করে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন, –

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
কালেন নাতিদীর্ঘেণ ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥

(ভাঃ ২/৮/৪)

'বহুভির্মিলিত্বা যথ কীর্তনম্ তদেব সঙ্কীর্তনম্'–বহু লোক

মিলে যে কীর্তন, তাহাই সঙ্কীর্তন। শ্রীগৌড়ীয় সমাজ বর্তমানে কি করছেন? বহু প্রচারক রকম রকম ভাবে হরিকথা কীর্তন করছেন? কেহ সুর-তালের সহিত, কেহ নৃত্য করে, কেহ ছায়াচিত্রে বক্তৃতা দিয়া, কেহ গ্রন্থাদি রচনা করে হরিকীর্তন করছেন। সুর-তাল-লয়-মান- যোগে লোকের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে উচ্চ-চীৎকারই যে সংকীর্তন, তাহা নহে। বস্তুতঃ তাহা কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্তন নহে। 'কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন' বলতে অপ্রাকৃত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত নামের কীর্তন, অপ্রাকৃত রূপের কীর্তন, অপ্রাকৃত গুণের কীর্তন, অপ্রাকৃত পরিকর-বৈশিষ্ট্যের ও অপ্রাকৃত লীলার কীর্তন বুঝায়। আবার সুর-তাল-মান-লয় ত্যাগ করলেই যে কৃষ্ণকীর্তন হবে, তাহাও নয়। সুর-তাল-মান সমস্তই কৃষ্ণকীর্তনেই লাগবে। ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী কৃষ্ণকীর্তনের সেবক। কায়মনোবাক্যে হরিকীর্তন বিধেয়। কায়িক কীর্তন, বাচনিক কীর্তন, মানসিক কীর্তন যুগপৎ করতে হবে। মন যদি কৃষ্ণকীর্তন না করে, অন্যমনস্ক হয়ে থাকে, তাহা হলে কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্তন হয় না। নারদ কি করেন? সর্বেন্দ্রিয়ে সর্বক্ষণ কৃষ্ণকীর্তন করেন। পঞ্চমুখে শিব কি করেন ? কৃষ্ণকীর্তন করেন। চতুর্মুখে ব্রহ্মা কি করেন ? কৃষ্ণকীর্তন করেন। ব্যাস, শুক, চতুঃসন, শেষ-তারা সকলেই কৃষ্ণকীর্তন করেন। আমাদের গুরুবর্গ সকলেই কৃষ্ণকীর্তনকারী, তাঁরা কেহই তথাকথিত মৌনী নহেন। ভাগবত ধর্ম তথাকথিত মৌনী থাকার ধর্ম নহে,-তাহা কীর্তনের ধর্ম-সঙ্কীর্তনের ধর্ম। গৌড়ীয় সমাজে যাঁরা গ্রন্থ রচনা করছেন, প্রবন্ধ লিখছেন,

(১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বৈষ্ণব ঐতিহ্যের ইতিহাস

– শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ

শ্রীধাম মায়াপুরে ২০০০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে গৌরপূর্ণিমা উপলক্ষেএক সপ্তাহব্যাপী 'মায়াপুর ইন্সটিট্যুট অব হায়ার এডুকেশন'সংস্থায় প্রদত্ত এক বিশেষ প্রবচন থেকে সংকলিত।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কারণ

কালের আবর্তন হয় চক্রাকারে। যেমন, একটি সেকেন্ডের পরে আর একটি সেকেন্ড আসে, একটি মিনিটের পরে আর একটি মিনিট শুরু হয়। একটি দিনের পরে শুরু হয় আর একটি দিন। একটি সপ্তাহের পরে আবার শুরু হয় আর একটি সপ্তাহ। একটি মাসের পরে শুরু হয় অন্য একটি মাস। এবং একটি বছরের পর শুরু হয় অন্য একটি বছর। এইভাবে আমরা দেখতে পাই, কাল চক্রাকারে ভ্রমণ করে। কালের যে বৃহত্তর চক্র বা আবর্তন সেটি হচ্ছে যুগ। চারটি যুগ-সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। এই চারটি যুগ নিয়ে চতুর্যুগ এবং সেই চতুর্যুগের পরে আর একটি চতুর্যুগ। সত্যযুগের পরে আসে ত্রেতা, ত্রেতা যুগের পরে আসে দ্বাপর, দ্বাপরের পরে আসে কলি, কলির পরে আবার সত্যযুগ। এমনি করেই কালের আবর্তন হয় চক্রাকারে। এইভাবে একহাজার চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন হয়। এবং সেই একদিনে প্রতিদিন একবার স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রহ্মাণ্ডে আসেন। কখন আসেন-অষ্টবিংশতি চতুর্যুগে। একহাজার চতুর্যুগের মধ্যে অষ্টবিংশতি চতুর্যুগের দ্বাপরে ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হন। সেই স্বয়ং ভগবানের রূপটি দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর মুরলীধর। এটি হচ্ছে ভগবানের স্বরূপ বা স্বয়ংরূপ। সেই স্বয়ংরূপ ভগবান থেকে প্রথম বিস্তার হয় বলরামের। বলরাম থেকে বিস্তার হয় দ্বারকার চতুর্ব্যূহ। অর্থাৎ বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। তারপর সেই সংকর্ষণ থেকে বৈকুণ্ঠের অসংখ্য নারায়ণের বিস্তার হয় বৈকুণ্ঠলোকে। আর তারপরে এই জগৎ সৃষ্টির জন্য সেই সংকর্ষণের অংশ মহাবিষ্ণুরূপে তিনি কারণসমুদ্রে শয়ন করেন এবং তাঁর নিশ্বাঃসের ফলে যে বুদবুদের সৃষ্টি হয়ে কারণ সমুদ্রে উঠে, সেই বুদবুদগুলি এক একটি ব্রহ্মাণ্ড।

এইভাবে শাস্ত্রে চিৎ-জগৎ এবং জড় জগতের বর্ণনা রয়েছে। এই স্বয়ংরূপ ভগবান অর্থাৎ বৃন্দাবনের লীলাবিলাসকারী ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। যিনি স্বয়ং ভগবান, তিনি এই জড় জগতে অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মার একদিনে একবার অবতীর্ণ হন। সৌভাগ্যক্রমে এইটি হচ্ছে অষ্টবিংশতি চতুর্যুগ। অর্থাৎ এই যুগে আজ থেকে ৫০০০ বছর আগে দ্বাপর যুগে স্বয়ং ভগবান লীলাবিলাস করে গেছেন। ভগবান তাঁর সেই বৃন্দাবন লীলাবিলাস করার পর পরবর্তী কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হন এই নবদ্বীপ ধামে। নবদ্বীপ হল নয়টি দ্বীপের সমন্বয়। নব মানে নয়, দ্বীপ হচ্ছে চতুর্দিকে জল বেষ্টিত ভূমি। মাঝখানে একটি দ্বীপ আর তার চারপাশে আটটি দ্বীপ একটি
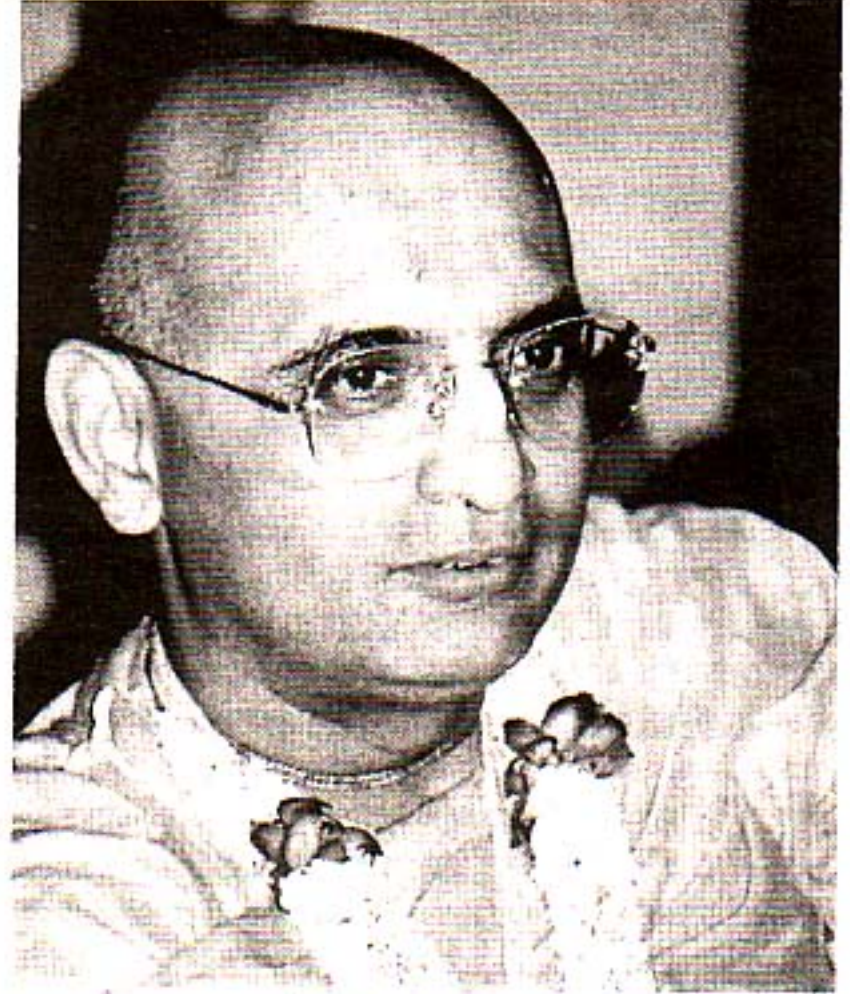
পদ্মফুলের মতো বিরাজ করছে। পদ্মফুলের মাঝখানে কোড়ক রয়েছে। কোরকের চারপাশে রয়েছে পাপড়ি। প্রথম পর্যায়ে আছে আটটি পাপড়ি। তারপর ১০০ পাপড়ি-এইভাবে বিন্যস্ত।

সহস্রপত্র কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্

তৎকর্নিকার তর্দ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্ ॥ ২ ॥

তৎকীঞ্জল্কং তদংশানাং তৎপত্রাণি শ্রিয়ামপি ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মসংহিতায় এইভাবে গোলোকের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই নবদ্বীপ হচ্ছে সেই গোলোক। গোলোকের দু'টি প্রকোষ্ঠ, একটি বৃন্দাবন অপরটি নবদ্বীপ। বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ তাদের মাধুর্য লীলাবিলাস করছেন এবং সেই রাধাকৃষ্ণই মিলিতভাবে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর রূপে ঔদার্য লীলবিলাস করছেন। মধুর রসে ভগবান তাঁর ভক্তদের সঙ্গে যে প্রেম বিনিময় করছেন, সেইটি হচ্ছে মাধুর্য লীলা। অর্থাৎ মধুর রসে যে লীলা। শ্রীরাধা আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্যই বা কিরকম ? এবং আমার মাধুর্য আস্বাদন করে শ্রীরাধা যে সুখ অনুভব করেন, সেই সুখই বা কিরকম-এই তিনটি বিষয় শ্রীকৃষ্ণের জানার লোভ হয়েছিল। এবং এইগুলি জানার জন্যই শ্রীকৃষ্ণকে রাধারাণীর ভাব অবলম্বন করে আসতে হয়েছিল।

সৌখ্যঞ্চাস্য মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা

এই মত সকল-শাস্ত্রের অভিপ্রায়। ইহাতে সন্দেহ যার, সে-ই দুঃখ পায়॥

তত্ত্বাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা ১/৬)

সমুদ্র মন্থনের ফলে ক্ষীরসমুদ্র থেকে যেমন চন্দ্রের উদয় হয়েছিল, ঠিক তেমনই শচীমাতার গর্ভরূপ-সিন্ধু মন্থনের ফলে চৈতন্যচন্দ্রের উদয় হয়েছেন, রাধাপ্রেমের পূর্ণ মহিমা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য। এটি আভ্যন্তরীন কারণ। এবং বাহ্যিক কারণটি হল কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করার জন্য, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে-

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দয়ার কথা, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যে, অপূর্ব তত্ত্ব, সেটি বিচার করে দেখো। বিচার করে দেখলে চিত্ত চমৎকৃত হবে। চৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষার পাঁচটি বিষয় রয়েছে। তাঁর দর্শনকে বলা হয় অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব। বেদের যে নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান সেটি তিনটি পর্যায়ে প্রকাশিত। ১) সম্বন্ধ ২) অভিধেয় ৩) প্রয়োজন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই তিনটি তত্ত্বকে প্রকাশ করেছেন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যে দান তা অকল্পনীয়।

মহাপ্রভু নিজে কোন গ্রন্থ লেখেননি। তিনি কেবল শিক্ষাষ্টকের আটটি শ্লোক দিয়ে গেছেন। এই আটটি শ্লোকের মধ্যেই ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞান পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। এই আটটি শ্লোক কেউ যদি পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তাহলে তিনি ভগবৎ-তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করতে পারবেন। মহাপ্রভুর শিক্ষা হল-

আরাধ্য ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং।
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যাকল্পিতা ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরঃ ন পরঃ ॥

আরাধ্য ভগবান হচ্ছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। নন্দ-যশোদার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ। অর্থাৎ দেবকী নন্দন বাসুদেব কৃষ্ণ নন। তাঁর ধাম হচ্ছে বৃন্দাবন। ব্রজ-গোপিকারা যেভাবে কৃষ্ণকে ভালোবেসেছিলেন বা আরাধনা করেছিলেন, সেটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা। অমলপুরান শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে এর প্রমাণ। শাস্ত্র প্রমাণ ছাড়া আমরা কতকগুলো মনগড়া কথা বলতে পারি না। যদি বলা হয় তা সাধুসমাজ গ্রহণ করবে না। আমরা যখন অধ্যাত্মতত্ত্ব নিরূপণ করব, তখন শাস্ত্রের প্রমাণ দিতে হবে। আঠরোটি পুরাণের মধ্যে এটি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ। যার মধ্যে কোন মল নেই। অন্যান্য যে সতেরটি পুরাণ আছে, তাতে হয় সত্ত্বগুণের মল নতুবা রজগুণের মল নতুবা তমগুণের মল রয়েছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে নির্মল।

কৃষ্ণপ্রেম হচ্ছে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে সেই কৃষ্ণপ্রেম। এইটি হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা। এটিকে আদরের সঙ্গে গ্রহণ

করতে হবে, অন্য কিছু নয়। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীরা ভুরি ভুরি গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং সেই গ্রন্থগুলি রচনার মাধ্যমে তাঁরা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষার সর্বোত্তম বা সর্বশ্রেষ্ঠ তাৎপর্য কি তা নিরূপণ করে গেছেন।

নানাশাস্ত্র-বিচারণৈক-নিপুণৌ সদ্ধর্ম-সংস্থাপকৌ
লোকানাং হিতকারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ।
রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দভজনানন্দেন মত্তালিকৌ
বন্দে রূপ- সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥

নানা শাস্ত্র বিচার করে গোস্বামীগণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যে মত সেটি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। মহাপ্রভু নিজে কিছু লিখে যান নি। তিনি মুখে মুখে শিক্ষা দিয়েছেন। এবং তাঁর যে শিক্ষা সেটি হচ্ছে-আধ্যাত্মিক জীবনের সারাতিসার। চৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষাটি যে প্রকৃত সনাতন ধর্ম সেটি ষড়গোস্বামীগণ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন জগতের মানুষদের হিতসাধনের জন্য। সেইজন্য তাঁরা ত্রিভুবনে বরণীয় এবং স্মরণীয়। ত্রিভুবন তাদের মান্য করেন এবং তাদের শরণাগত হন। আমি বার বার সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদগণের বন্দনা করি।

– চলবে।

স্কন্দ পুরাণে বর্ণিত প্রাচীন রথযাত্রা

– ভক্তিপ্রতাপ দাস ব্রহ্মচারী

হাজার হাজার বছর আগে পুণ্য ভারতভূমিতে শ্রীশ্রীরথযাত্রা কিভাবে উদ্‌যাপিত হত, তার আনুপূর্বিক বর্ণনা রয়েছে স্কন্দ পুরাণের বিষ্ণুখণ্ডে।

প্রাচীনকালে বৈশাখ মাসের রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত শুক্লপক্ষীয় সর্বপাপবিনাশিনী তৃতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রীরথযাত্রার উদ্যোক্তাকে শুচিশুদ্ধ হয়ে সুযোগ্য আচার্যের আনুগত্য অনুসারে একজন সুত্রধরকে বস্ত্রালঙ্কারে সাদরে বরণ করতে হত। মন্ত্রশুদ্ধির পরে সেই সুত্রধর অর্থাৎ ছুতার মিস্ত্রিকে বনের মধ্যে যেখানে উত্তম বৃক্ষ আছে, সেখানে নিয়ে যাওয়া হত। সেই গাছের নিচে হোমাগ্নি জ্বেলে অষ্টোত্তরশত আহুতি প্রদানের বিধি ছিল। তারপরে বনস্পতির প্রীতি সাধনের উদ্দেশ্যে একশত দুগ্ধান্ন আহুতি প্রদান করা হত।

এই সময়ে আচার্য মঙ্গলগীত সহকারে শ্রীগরুড়ধ্বজকে স্মরণ করে তূর্যধ্বনিসহ কুঠার হাতে মন্ত্রোচ্চারণমুখে ঘৃতধারাসিক্ত সেই বৃক্ষমূল থেকে কিছু অংশ ছেদন করতেন। তারপর সুত্রধরকে সেই বৃক্ষ ছেদনে নিযুক্ত করা হত। সেই বৃক্ষ থেকেই রথ নির্মাণের কাঠ সংগ্রহ হত।

ভগবান শ্রীজগন্নাথ দেবের রথের লৌহময় ষোলটি চাকা হত এবং চাকার ষোলটি করে অরপাখি (ইদানিং যাকে বলে 'স্পোক') থাকত। রথের চারদিকে বিচিত্রভাবে তৈরী কাঠের পুতুল থাকত এবং মাঝখানে একটি ২২ হাত উঁচু বেদি হত। বেদির চারদিকে চারটি সুন্দর তোরণ ও মনোহর দ্বার থাকত এবং সেগুলি বিবিধ কারুকার্যে বিভুষিত হত এবং সুদৃশ্য বস্ত্রে সুমণ্ডিত হত। বেদিটিকে পতাকা মালায় সাজানোর বিধি ছিল এবং রথের ওপরে রক্তচন্দন কাষ্ঠের গরুড়ধ্বজ লাগানো থাকত। গরুড়ের দেহ হত বেশ নধর, নাক সুদীর্ঘ, কর্ণকুণ্ডল শোভিত এবং সর্বাঙ্গে অলঙ্কার থাকত। ঠোঁটে ধরা থাকত একটি সাপ। দেখলে মনে হত, গরুড়ধ্বজ পাখনা মেলে উড়ে যাচ্ছেন।

এইভাবে বলরামের রথে চৌদ্দটি চাকা এবং সুভদ্রা দেবীর রথে বারোটি চাকা লাগানো হত। বলরামের রথের ওপরে রাখতে হত লাঙ্গলধ্বজ এবং সুভদ্রার রথে পদ্মধ্বজ থাকত।

রথ তিনটি তৈরি হলে আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে বিষ্ণুর প্রীতিপ্রদ শুভদিনে মন্ত্রপাঠ ও বিধানানুসারে মহাসমারোহে সেগুলির প্রতিষ্ঠা উৎসব উদ্‌যাপিত হত। যাতে ঐ রথগুলিতে কোনও মানুষ, পশুপাখি উঠতে না পারে, সেইভাবে অতি সযত্নে রক্ষা করার বিধি মেনে চলতে হত উদ্যোক্তাদের।

ভগবান রথে আরোহণ করে যে-পথে গমন করতেন, সেই পথটিকে উত্তমরূপে সংস্কার করা হত এবং সেই পথের উভয়পাশে তরুগুল্ম; পুষ্পস্তবক, পুষ্পমাল্য, রেশমী বস্ত্র এবং চামরাদি সাজানোর আয়োজন করতে হত। রথ যাতে অনায়াসে যেতে পারে, সেজন্য পথটিকে সুন্দরভাবে সমতল করার উদ্যোগ নেওয়া হত। কোথাও এতটুকু কাদা, কাঁকর রাখতে দেওয়া হত না। সমগ্র যাত্রাপথে সুগন্ধি ছড়ানো হত, যাতে সকলেই সুখে বিচরণ করতে পারত।

ঐ যাত্রাপথের চতুর্দিক যাতে আমোদিত হয়, সেজন্যে সুগন্ধি দ্রব্যে পূর্ণ পাত্র ও চন্দনের জল ছড়ানোর যন্ত্র স্থাপন করা হত। শ্রীজগন্নাথদেবের রথ গমনকালে পুষ্পবৃষ্টি করার জন্য স্থানে স্থানে পুষ্পরাজি স্থাপন করতে হত এবং বহু গায়ক আর নর্তক সেই সময়ে নৃত্যগীত করে চলত। সেই সঙ্গে মৃদঙ্গ, শিঙা, বাঁশি, বীণা, ভেরী, ঢাক প্রভৃতি বাজানোর আয়োজন করা হত।

রথযাত্রায় বহু প্রকারে চিত্রবিচিত্র বহু পতাকা ওড়ানো হত, আর সেই সঙ্গে সোনা ও রূপোর তৈরী অনেক ধ্বজা বহন করে নিয়ে যাওয়া হত।

আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষীয় পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত দ্বিতীয়াতে অরুণোদয়কালে শ্রীজগন্নাথদেবকে মহাসমারোহে রথারূঢ় এবং অর্চনা করে মহোৎসবের অনুষ্ঠাতা সমবেত বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী ও ঋষিবর্গের সাথে কৃতাঞ্জলী হয়ে রথযাত্রার আবেদন জানিয়ে নীলাচলনাথের কাছে প্রার্থনা জানাতেন-"হে প্রভো! আপনি পুরাকালে ভূপতি ইন্দ্রদ্যুম্নকে যেভাবে আদেশ করেছিলেন, আমি সেইভাবে উদ্যোগী হয়েছি। হে নাথ ! আপনার জয় হোক, আপনি রথে আরোহণ করে গুণ্ডিচা মণ্ডপে যাত্রা করুন। আপনার কৃপা দর্শনে দশদিক পবিত্র হোক এবং চরাচর বিশ্ববাসী কল্যাণপ্রদ মোক্ষলাভ করুক। হে ভগবান ! আপনি সকলের প্রতি অনুগ্রহ করে এই শ্রীমূর্তি গ্রহণ করেছেন।"

তারপর শ্রীজগন্নাথদেবকে নিয়ে উত্তরাভিমুখে রথযাত্রা শুরু হলে ব্রহ্মণেরা পথিমধ্যে সূক্ত মন্ত্রাদি উচ্চারণ করে চলতেন এবং ভগবানের অঙ্গে কর্পূরচূর্ণ আর পুষ্প বর্ষণ করা হত। তখন কেউ মঙ্গলগাথা পাঠ করত, কেউ কেউ জয় ধ্বনি দিত।

জনগণ সকলে করতালির দ্বারা সুমধুর নিনাদ সৃষ্টি করত। চারিদিকে সোনার পাত্র থেকে কৃষ্ণাগুরু সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ত এবং বেণু, বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি শোনা যেত।

এইভাবে মহাসমারোহের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি সমবেত হয়ে আগে বলরাম, পরে সুভদ্রা এবং তারপরে শ্রীজগন্নাথদেবকে রথযাত্রা সহকারে ধীরে ধীরে নিয়ে যাওয়া হত। সেই সময়ে ভগবানের দুই দিক হতে রত্নখচিত স্বর্ণদণ্ডসমন্বিত ছত্র ধারণ করে থাকতেন ভক্তমন্ডলী এবং চামরাদি ব্যজন করা হত। তখন ভগবানের প্রীতি সাধনের জন্য কি রাজা, কি ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ, কি অন্যান্য সকল নীচজাতীয় মানুষেরা এবং কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেই যে যার সাধ্যমতো ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করার সুযোগ পেতেন।

রথের মধ্যে বিগ্রহের প্রীতি সাধনের জন্য তুলায় ভরা শয্যাসন রাখা হত এবং তার ওপর ভক্তিভরে বস্ত্রালঙ্কার ও মাল্যাদি দ্বারা তাঁদের বিভূষিত করে স্থাপনা এবং অর্চনা করা হত।

স্কন্দপুরাণের বিষ্ণুখণ্ডে শ্রীশ্রীরথযাত্রা মহোৎসবের এইরূপ দিব্য তাৎপর্য্য বর্ণনা প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তের কাছে ভগবানের রথাযাত্রার চেয়ে পূজ্যতম উৎসব আর নেই। ভক্তবৎসল কৃপাময় ভগবান এইভাবে বলরাম ও সুভদ্রার সাথে রথারোহণে যেতে যেতে স্বীয় শ্রীমৃদঙ্গের সমীরণ সংস্পর্শে দেহিগণের পাপপুঞ্জ বিদুরিত করে থাকেন।

ভগবান স্বভাবসিদ্ধ মুক্তিপ্রদ হলেও অজ্ঞ ও বিশ্বাসহীন জীবগণের বিশ্বাস উৎপাদনের উদ্দেশ্যেই রথাযাত্রাদি লীলা করেছেন। জগদ্বন্ধু কৌতুকবশে রথে আরোহণ করে যে সময়ে মহোৎসবে গমন করেন, সেই সময়ে শোভাযাত্রায় ইন্দ্রাদি-দেববৃন্দও আত্মাভিমান পরিত্যাগ করে নিজ নিজ দিব্য পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে ভগবানের দুই পাশে সারিবদ্ধ হয়ে রথের সঙ্গে এগিয়ে চলতে থাকেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মাও ব্রহ্মলোক থেকে এসে দেবগণের আগে আগে রথযাত্রা মহোৎসবে যোগ দেন এবং প্রতি পদক্ষেপে বৈদিক স্তবের দ্বারা শ্রীজগন্নাথদেবকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাতে থাকেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব এইভাবে মহাসমারোহে রথে আরোহণ করে যেতে যেতে মধ্যাহ্নকালে সূর্যদেব যখন দেবগণের, বিশেষত জনগণের ললাট সন্তপ্ত করতে থাকেন এবং রথরজ্জু আকর্ষণকারী সকলে নিতান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েন, তখন ভগবান পথিমধ্যে অচলভাবে অবস্থান করতে থাকেন।

ঐ সময়ে তাঁর প্রশান্তির উদ্দেশ্যে পঞ্চামৃত ও পুষ্প কর্পূর সুবাসিত শীতল জলে তাঁর অভিষেক সম্পন্ন করা হত এবং চন্দন-কর্পূর-কস্তুরী দ্বারা তাঁর শ্রীঅঙ্গ লেপন করা হত। সেই সময়ে দেবত্রয়কে শর্করা, সুমধুর পেয়, মিষ্টান্ন, খেজুর, নারিকেল, কলা, তাল, আখ, দুগ্ধজাত সুখাদ্য, সুবাসিত সুশীতল জল এবং কর্পূর-লবঙ্গাদি-সুবাসিত তাম্বুলাদি সহকারে পূজা নিবেদনের রীতি ছিল।

বিকেলে পুনরায় রথযাত্রা শুরু হত এবং যথারীতি স্তুতিপাঠ, পুষ্পবর্ষণ, চামর সঞ্চালন, গীতবাদ্যাদির আয়োজন থাকত। নীলাদ্রিনাথ এইভাবে যেতে যেতে সূর্যদেব অস্তমিত হলে চতুর্দিকে হাজার হাজার দীপমালা জ্বালিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কী মনোরাম হত সেই সান্ধ্যকালীন দৃশ্য।

শেষে গুণ্ডিচা মন্দিরে উপনীত হলে বিগ্রহত্রয়কে অবরোহণ করিয়ে সুসজ্জিত একটি রাজকীয় মণ্ডপে চন্দ্রাতপের মাঝে স্থাপনা করার নিয়ম ছিল। সেই মণ্ডপ দেখলে মনে হত, ত্রৈলোক্যের সর্বাড়ম্বরযুক্ত মহাযজ্ঞের মহাবেদীতে দারুব্রহ্ম সদ্যাই প্রাদুর্ভূত হয়েছেন।

গুণ্ডিচা বাড়িতে ভগবান জনার্দন সাতদিন অবস্থান করেন। পূর্বে তিনি স্বয়ং ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে বর দিয়েছিলেন, "হে রাজেন্দ্র আমি প্রতি বৎসর বিন্দুতীর্থতটে সাত দিন অবস্থান করব এবং তখন সেখানে সমুদয় তীর্থই অবস্থান করবে।"

তারপর অষ্টম দিনে রথ তিনটিকে আবার দক্ষিণাভিমুখ করে বস্ত্র, মাল্য, পতাকা, চামরাদি দিয়ে সাজানো হত এবং নবম দিনে প্রাতঃকালে মহাসমারোহে সেই রথগুলিতে বিগ্রহত্রয়কে পূর্বের মতো অধিষ্ঠিত করা হত।

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দক্ষিণাভিমুখী এই পুনর্যাত্রা অতি দুর্লভ। রথের পূর্বযাত্রা ও পুণর্যাত্রা-দুটিই মুক্তি প্রদায়ক। এই উভয় অনুষ্ঠান একই উৎসব বলে পুরাবিৎ পণ্ডিতেরা ভগবানের এই রথযাত্রাকে 'নবদিনাত্মিকা' যাত্রা বলে থাকেন।

রথে অধিষ্ঠিত দারুব্রহ্মের দর্শনলাভে কৃতার্থ মানুষের সর্বপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান, সর্বতীর্থে স্নান ও সর্ববিধ দানের ফললাভ হয়। ভগবানের রথচ্ছায়া পর্যন্ত স্পর্শ করলেও ব্রহ্মহত্যা পাপ দুরীভূত হয়। ভক্তি ব্যতীত কেবল যাত্রা-কৌতুকবশে রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের অনুগমন করলেও অশেষ ফললাভ হয়। রথারূঢ় ভগবানকে 'জয়কৃষ্ণ' মহামন্ত্র সহকারে প্রণাম জানালে ইহজগতে আর ফিরে আসতে হয় না, স্কন্দপুরাণে (বিষ্ণুখণ্ডে) একথা বলা হয়েছে।

প্রকৃত জ্ঞান বা শিক্ষা অর্জনে ছাত্র-সমাজের আধ্যাত্মিক শিক্ষার গুরুত্ব

-শ্রী বিমল নিতাই দাস

যে জ্ঞান আত্মোপলব্ধির শিক্ষা দেয়, নৈতিকতার শিক্ষা দেয়, সে জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান বা শিক্ষা। নৈতিকতা ও আদর্শবিহীন যে শিক্ষা তাকে কখনো প্রকৃত জ্ঞান বা শিক্ষা বলা যায়.না। যেমন, চৌর্য্যবৃত্তি থেকে শুরু করে যে জ্ঞান বা শিক্ষা মানুষের জীবনকে শুধু আত্মকেন্দ্রিক ও ভোগ লিপ্সাকে বাড়িয়ে জীবনকে ঠেলে দেয় নিদারুন অনিশ্চয়তার দিকে- সে জ্ঞানই নৈতিকতা ও আদর্শবিহীন জ্ঞান বা শিক্ষা।

ছাত্রদের আধ্যাত্মিক শিক্ষার বিষয়ে বলছি- যে ছাত্ররা সমাজ ও দেশের ভবিষ্যত কর্ণধার, তাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা তারা যে শিক্ষায়, শিক্ষিত হয়ে উঠবে, ভবিষ্যৎ সমাজ সেভাবেই গড়ে উঠবে। জীবনের প্রাথমিক অবস্থা থেকেই ছাত্রদের আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা কর্তব্য। যে বয়সে শরীর ও মনে থাকে অমিত তেজ, অদম্য উৎসাহ-সেটিই প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের উপযুক্ত সময়। জীবনের এরূপ অবস্থায় যদি ছাত্ররা নৈতিকতার বীজ বপনের সুযোগ না পায় তাহলে ভবিষ্যৎ জীবনে আদর্শচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বর্তমান যুগ কলিযুগ। প্রকৃতিগতভাবে এ যুগে মানুষের মধ্যে ভোগলালসা বেশী। মানুষের মধ্যে ভোগ লালসার আকাঙ্খা বেশী হওয়ায় তারা আত্মকেন্দ্রিক, পরনির্ভর ও তোষামোদ স্বভাবের হওয়ায় সর্বদা স্নায়বিক চাপের মুখে থাকতে হয়। সীমাহীন ভোগলালসার দিকে ধাবিত হওয়ায় মোহ ও মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দিন দিন দুঃখ-দূর্দশা বেড়েই চলে তা কোন ক্রমেই কমেনা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন-

মামৈবাংশো জীবলোকে জীবভূত সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়ানি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥

গীতা ১৫/৭

জীব ভগবানের সনাতন অংশ তাই প্রতিটি জীবের কর্তব্য পূর্ণতার দিকে ধাবিত হওয়া। চুরাশি লক্ষ যোনী ভ্রমন করে আমরা দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করেছি। মানব শরীর গ্রহণের আগে স্রষ্ঠার কাছে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি, ধরাধামে গিয়ে তোমার সেবা-পূজা করবো- প্রকৃতপক্ষে আমরা তা করি না। ফলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের যে দুর্দশা, প্রতিনিয়ত আমরা তার কবলে পড়ছি।

ভগবানের অংশ হওয়ার ফলে জীব তাঁর সেই শক্তি সম্ভূত- তাই জীবও দিব্য, কিন্তু জড়া শক্তির সংস্পর্শে আসার ফলে তাদের সেই প্রকৃত দিব্যস্বরূপ মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। এ মায়ার বন্ধন কি তা আমাদের একটু জানার দরকার। ভগবানের নির্দেশিত পথে যে মায়া তা যোগমায়া- ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের ৩৪নং শ্লোকে বলা হয়েছে- প্রত্যেক বস্তুকে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত করার যথার্থ সিদ্ধান্তকে বলা হয় যোগমায়া বা যুক্ত করার শক্তি। ভগবানের সম্পর্ক থেকে বিচ্যুত করার ভ্রান্ত ধারণাকে বলা হয় দৈবী মায়া বা মহামায়া। এই মায়ার দুই প্রকার শক্তি রয়েছে- আবরনাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি। আবরনাত্মিকা শক্তির মাধ্যমে মায়া অজ্ঞানের আবরনে জীবের জ্ঞানচক্ষু আচ্ছাদিত করে, ফলে ভগবানের অস্তিত্ব বিস্মৃত হয় এবং বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির মাধ্যমে মায়া জীবকে অজ্ঞানের অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। মায়ার দ্বারা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক, বিচ্ছেদের ভ্রান্ত ধারণা মিথ্যা নয়-মায়িক।

কলিযুগ যেমন ভয়াবহ-তার পাপ পঙ্কিলতার জন্য, তেমনি চৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন যজ্ঞের মাধ্যমে সহজ করে দিয়েছেন কলিযুগের মানব কুলের উদ্ধারের পন্থা। সে উপলব্ধির জন্য ছাত্র অবস্থা থেকেই আমাদের আচরণ অধ্যাবসায়ের প্রয়োজন।

জড় জাগতিক চাপে আজকের যুগের ছাত্ররা আধ্যাত্মিক শিক্ষার গুরুত্বকে খাটো করে দেখে। তারা উপলব্ধি করতে পারে না যে, কৌমার বয়স থেকেই আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠা উচিৎ। জড়জাগতিক যে উন্নতি আমরা দেখতে পাই, এর মূলে রয়েছে ভাগবতীয় আদর্শের ভূমিকা। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, মহাত্মাগান্ধি জড়জাগতিক সমাজের অত্যন্ত উঁচু স্তরে অধিষ্ঠিত। তাঁর অহিংসনীতির জন্য পৃথিবীর বড় বড় যাদুঘরে আবক্ষমূর্তি স্থাপিত হয়েছে আপামর জনসাধারনের মধ্যে প্রদর্শনের জন্য। দক্ষিন আফ্রিকায় তিনি একসময় কর্মরত ছিলেন। তাঁর কর্মজীবনের উপর সেখানে চলচিত্র নির্মান করে প্রচার করা হয়। তাঁর এ আদর্শ ছিল ভাগবতীয় আদর্শ। তিনি যে অহিংস নীতির প্রবর্তন করেছিলেন- তা আজকে সারা বিশ্বে সমাদৃত।

সারা পৃথিবীতে আজকে যদি ভাগবতীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা হতো, তাহলে এত দুঃখ দুর্দশা মানুষের মধ্যে থাকত না। মাংস আহারের জন্য পশু হত্যা যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে, তাতে ভবিষ্যতে এটি ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। ইতিপূর্বে ইংল্যান্ডে গরুর মধ্যে যে ম্যাড কাউ ডিজিজ দেখা দিয়েছিল- তাতে বহু মাংস ভক্ষনকারী মানুষ রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। জড়জাগতিক উন্নতির ফলে মানুষের জীবন ধারণে পরিবর্তন এসেছে, বৈদিক সমাজের পরিবর্তে শিল্প ভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠায় বহু কলকারখানা স্থাপিত হয়েছে। এই কলকারখানার ধোঁয়া ও বর্জ্য পদার্থ পরিবেশকে করছে দূষিত। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় জলে জলচর প্রানীর মড়ক শুরু হয়। আবহাওয়ায় এ প্রভাব পড়ে ঘূর্নিঝড়, জলোচ্ছাসের মত প্রাকৃতিক দূর্যোগের ফলে- প্রাণহানী হচ্ছে অসংখ্য প্রাণীর। আজকে যদি ভাগবতীয় আদর্শে পৃথিবী চলত তাহলে, এরূপ আশংকাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হত না। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে আগামী দিনের কর্ণধার বর্তমান যুব সমাজকে

ভাগবতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। যাতে করে সারা বিশ্বে একটি ভাগবতীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায়, যার সূচনা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শের ভিত্তিতে শ্রীল এ.সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ করে গেছেন। সে অনুযায়ী পাশ্চাত্য দার্শনিক এম,এন, ব্যাশাম উল্লেখ করেছেন- "প্রভুপাদ যে গৃহ নির্মান করেছেন-তাতে সারা পৃথিবীর মানুষ আশ্রয় পেতে পারে।"

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হয়েছে- গত কয়েকদিন আগে জাপানে দলগতভাবে কয়েক জোড়া তরুণ-তরুণী আত্মহত্যা করেছে, এটি নাকি জাপানে ৩৪তম দলগত আত্মহত্যা। এর কারণস্বরূপ পত্রিকায় বলা হয়েছে- জীবনের প্রতি হতাশ হয়ে এ আত্মহত্যা ঘটেছে। এ হত্যার আমরা যদি কারণ অনুসন্ধান করতে যাই-তবে দেখতে পাব,- অত্যাধিক নেশা জাতীয় দ্রব্যের প্রতি আসক্তিই হয়ত এরূপ অপমৃত্যুর কারণ। জাপান একটি জড়জাগতিক উন্নতির দেশ, সে দেশের যুবক যুবতীরা পারমার্থিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে, শুধু জাপান কেন- গোটা বিশ্বে আজকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের বাংলাদেশের বর্তমান যুবকদের কথাই ধরুন। যুবকদের মধ্যে চলছে বেকারত্ব এবং হতাশা। লেখাপড়া শিখে তারা যে কর্মজীবনে প্রবেশ করবে, তার জন্য না হচ্ছে কর্মসংস্থান। তারা অলস জীবন যাপন করছে। ফলে দিন দিন জীবনের প্রতি উদাসীন হয়ে নানা কুকর্মে লীপ্ত হচ্ছে। তারা যদি ভাগবতীয় আদর্শে লালিত হত- তাহলে একটি সহজ সরল জীবনের দিকে অগ্রসর হত। বৈদিক রীতিনীতির ভিত্তিতে যদি জীবন পরিচালিত করতো- তাহলে এত বেকারত্ব ও হতাশা সমাজে থাকত না। কেননা আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তারা জানত এবং সে অনুযায়ী জীবন যাপনে কোন দুঃখ দুর্দশা তো থাকতো না, বরং সমাজে আসত অনাবিল শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং প্রতিষ্ঠা পেত একটি ভাগবতীয় সমাজ। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রকৃত জ্ঞান বা শিক্ষা অর্জনে ছাত্রদের আধ্যাত্মিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

(৪০ পৃষ্ঠার পর)

এখন দয়া করে শুরু কর।" এভাবে বিভ্রান্ত হয়ে, আমরা মনে করি যে এমন কি আমরা জড়-প্রকৃতিকেও জয় করে ফেলেছি। কিন্তু তা কিভাবে হয়? প্রকৃতি এখন আমাদের জন্ম, মৃত্যু জরা ও ব্যাধিরূপ দুঃখ দিয়ে চলেছে। কেউ কি এই সমস্যাগুলির সমাধান করেছে? তাহলে জ্ঞান ও সভ্যতার মাধ্যমে আমরা যথার্থভাবে কি উন্নতি করেছি? আমরা জড়া-প্রকৃতির কঠিন নিয়মের অধীন, কিন্তু তথাপি আমরা মনে করছি যে আমরা জয় করেছি। একে বলে মায়া।

এই দেহ প্রদানকারী পিতার কাছে আত্মসমর্পণ করা কিছুটা অসুবিধা হতে পারে, কারণ তার জ্ঞান ও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, কিন্তু কৃষ্ণ একজন সাধারণ পিতার মতো নয়। কৃষ্ণ অসীম ও তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান, সম্পূর্ণ শক্তি, সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য, সম্পূর্ণ সৌন্দর্য, সম্পূর্ণ যশ ও সম্পূর্ণ ত্যাগ বর্তমান। তেমন পিতার কাছে গিয়ে তাঁর সম্পত্তি উপভোগে আমাদের কি ভাগ্যবান মনে করা উচিত নয়? তথাপি কেউই এ ব্যাপারে যত্ন নেয় বলে মনে হয় না, এবং এখন প্রত্যেকেই নিজস্ব মত প্রচার করছে যে, ভগবান নেই। লোকে তাঁর খোঁজ করে না কেন ? ভগবদ্গীতার পরের শ্লোকে উত্তর দেওয়া আছে–

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

"সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারী, যারা মূঢ়, নরাধম, মায়াদ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত, যারা ঘোর নাস্তিক ভাবাপন্ন অসুর, তারা আমার কাছে আত্মসমর্পণ করে না। (গীতা ৭/১৫)

এভাবে মূঢ়দের শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। একজন 'দুষ্কৃতি' সব সময় শাস্ত্রবিধির বিরুদ্ধে কাজ করছে। আধুনিক সভ্যতার কাজ হচ্ছে শাস্ত্রবিধি ভঙ্গ করা–এই সবই হচ্ছে। সংজ্ঞা অনুযায়ী পুণ্যাত্মা সেই, যে শাস্ত্রবিধি ভঙ্গ করে না। 'দুষ্কৃতি' (পাপী) এবং 'সুকৃতি' (পুণ্যাত্মা)-র মধ্যে তুলনার অবশ্য মাপকাঠি থাকা চাই। প্রত্যেক সভ্যদেশেই কিছু ধর্মশাস্ত্র আছে–তা খ্রিষ্টান, হিন্দু, মুসলমান অথবা বৌদ্ধদেরই হোক্ না কেন। তা বিবেচনার নয়। উদ্দেশ্য এই যে প্রামাণ্য-গ্রন্থ শাস্ত্র তো আছে। যে শাস্ত্রবিধি পালন করে না সে-ই দুরাচারী আইন ভঙ্গকারী।

অন্য এক শ্রেণী সম্বন্ধে এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে–যারা মূঢ়, প্রথম শ্রেণীর বোকা। নরাধম সে-ই যে মানুষের মধ্যে অধম, এবং 'মায়য়াপহৃতজ্ঞান', যাদের জ্ঞান মায়াদ্বারা অপহৃত হয়েছে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে। আসুরং ভাবম্ আশ্রিতাঃ–তাদের উল্লেখ করা হয়েছে, যারা পুরোপুরি নাস্তিক। যদিও পিতার চরণে আত্মসমর্পণ করতে কোন অসুবিধা নেই, তবুও এই লক্ষণযুক্ত লোকেরা কখনও তা করে না। তার ফলে, তারা অবিরামভাবে পিতার প্রতিনিধি দ্বারা দণ্ড লাভ করে। তাদের চড় মারতে হবে, বেত মারতে হবে এবং প্রচণ্ডভাবে লাথি মারতে হবে, আর তাদের এসব ভোগ করতে হবে। যেমন এক পিতা তার অবাধ্য ছেলেকে শাসন করে, সেই রকম জড়া প্রকৃতিকেও নির্ধারিত পরিমাণ শাস্তি প্রয়োগ করতে হয়। সেই সঙ্গে প্রকৃতি খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ যোগান দিয়ে আমাদেরকে প্রতিপালন করছে। উভয় পন্থাই চলছে কারণ আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী পিতার সন্তান, এবং যদিও আমরা কৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করি না, তবু কৃষ্ণ অত্যন্ত দয়ালু। পিতা দ্বারা এত চমৎকারভাবে প্রতিপালিত হওয়া সত্ত্বেও, 'দুষ্কৃতি' তবুও ধর্ম বিরোধী কাজ করে। যে দণ্ড ভোগ করেই চলে-সে, বোকা, আর সে তো নরাধম–যে মনুষ্য জীবনকে কৃষ্ণোপলব্ধির জন্য ব্যবহার করে না। যে মানুষ তার যথার্থ পিতার সাথে তার সম্বন্ধ পুনর্জাগ্রত করার জন্য তার জীবনকে সদ্ব্যবহার করে না, তাকে নরাধম বলে গণ্য করতে হবে।

নারীর মধ্যে ভগবৎ প্রদত্ত সাতটি ঐশ্বর্য

– ভক্তিন্ সুস্মিতা

ভগবানের সৃষ্ট পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রথমজন যদি হন সৃষ্টির বাহক, অপরজন অবশ্যই ধারক। কন্যা, ভার্যা, মাতা, ভগিনী রূপে নারীর ভূমিকা অনবদ্য। নারীর মধ্যে সাতটি ভগবৎ-প্রদত্ত গুণাবলীর সমাবেশে তাঁর নারীত্বের বিকাশ ঘটে এবং সংসারে তিনি একজন আদর্শ নারী হিসাবে নিজের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতার ১০/৩৪ শ্লোকে বলেছেন, 'আমিই নারীর মধ্যে সাতটি মহান ঐশ্বর্য অর্থাৎ যশ, শ্রী, স্মৃতিশক্তি, বচনমাধুর্য, বুদ্ধিমত্তা, দৃঢ়তা বা ধৃতি এবং ধৈর্য রূপে অবস্থান করি।

অন্তরে এই সাতটি মহান ঐশ্বর্য বা শক্তি উপলব্ধি করে প্রতিটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে তা প্রয়োগ করতে সমর্থ নারীই একজন আদর্শ নারী রূপে চিহ্নিত হন।

১। নারীর প্রথম ঐশ্বর্য তার যশ বা খ্যাতি। ভগবৎ প্রদত্ত সকল গুণাবলী কারোর মধ্যে সঠিকভাবে প্রস্ফুটিত হলে তিনি একজন প্রকৃত নারী হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। এই গৌরব অর্জন সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু একাজ সহজতর হতে পারে যদি তিনি তাঁর অন্তরস্থিত সুপ্ত ভগবৎ-ভক্তি জাগরণে মনোনিবেশ করেন এবং শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করে সকল কর্তব্যকর্মে একাগ্র হন। একনিষ্ঠ হয়ে সকল ইন্দ্রিয়াদি সংযত করে ভক্তিলতা বৃক্ষকে পালন এবং রক্ষণের মাধ্যমেই তিনি চিন্ময় আলোর সন্ধান পাবেন। সেই কল্যাণদ্যুতিতেই ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পূন্য, কর্ম-অকর্ম, সকল বোধই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে। আপন অন্তরস্থিত পরমাত্মাই তাঁকে দর্শন করাবে অন্যের অন্তরের ভগবৎ-সত্তাকে। এভাবেই প্রকৃত পথের সন্ধান লাভে সমর্থ গৌরবান্বিতা নারী সকলকে পথ-প্রদর্শন করতে পারবেন। নিজের গৃহের তথা মানব সমাজের সকলকে কৃষ্ণভক্তিতে অণুপ্রাণিত করতে ও কল্যাণকারী কার্যে উৎসাহিত করতে সমর্থ হবেন।

নারীর পরবর্তী আকর্ষণ তাঁর শ্রী। তাঁর ভগবৎ প্রদত্ত সৌন্দর্য অর্থাৎ দেহ সৌষ্ঠব ও লালিত্য সহজেই পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু নারীর স্বাভাবিক অঙ্গকান্তি তাঁর সৌন্দর্যের পূর্ণতা নহে। স্বাভাবিক শ্রীর সাথে তাঁর ব্যক্তিত্ব সংযুক্ত হলেই সৌন্দর্য পূর্ণতা লাভ করে। একটি মানুষের শিক্ষা, রুচিবোধ, স্বতঃস্ফূর্ততা ইত্যাদি সম্বলিত ব্যক্তিত্বই তার সৌন্দর্যের প্রকৃত অস্ত্র। একজন শুদ্ধহৃদয় ভক্তপ্রাণা মহিলার বহিঃসৌন্দর্য যাইহোক না কেন তাঁর অন্তরের সৌন্দর্য অবশ্যই সকলকে আকর্ষণ করবে ও আনন্দ দান করবে। তাঁর অন্তরের নির্মল স্নিগ্ধ মাধুর্য অবশ্যই ভগবানের অনুগ্রহ লাভে সক্ষম হবে।

অন্যথায় বাইরের রূপলাবণ্যকে কেউ যদি তার অহংকার বা দম্ভের প্রতীক বলে মনে করে এবং সেই রূপ আচরণ করে, তাহলে তাঁর অন্তরের সৌন্দর্যকে তা ম্লান করে দেয়। এহেন নারীর সৌন্দর্য কখনই অন্যকে পূর্ণানন্দ দিতে সক্ষম হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণে শুদ্ধভক্তি পরায়না, যিনি নিত্যই কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ ও বিতরণ করে পরম তৃপ্তি লাভ করেন, হরিকথা শ্রবণ ও কীর্তনের মাঝে আত্মমগ্ন থাকেন, যিনি শ্রীশ্রীরাধামাধবের শ্রীচরণে সকল কর্মাদি ও দায়িত্ব উৎসর্গ করে আত্মোপলব্ধির স্তরে উন্নীতা সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্না, ভগবৎ সেবা জ্ঞানে সকল ভক্তকুলের প্রতি সেবা পরায়ণা, জিতেন্দ্রিয়া, পার্থিব বিষয়ে অনাসক্ত ও মানব কল্যাণে ব্রতী, তিনি পরমানন্দে সকল প্রকার দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়ে কালাতিপাত করেন এবং শুধুমাত্র পার্থিব সমাজের সমাদৃতা হন তাই নয়-তিনি স্বয়ং ভগবানেরও বিশেষ প্রীতির পাত্রী হয়ে ওঠার সৌভাগ্য অর্জন করেন। বহু সুকৃতি প্রসূত এই ভাগ্যশ্রী-ই নারীর অন্যতম ঐশ্বর্য।

নারীর অপর একটি বিশেষ গুণ তাঁর স্মৃতিশক্তি। কোনও একটি বিষয় অধ্যয়ন বা শ্রবণ করার পর তার বিষয়বস্তুকে সঠিকভাবে স্মরণে রাখতে পারার ক্ষমতাকে বলা হয় স্মৃতিশক্তি। যে যত উত্তম স্মৃতিশক্তির অধিকারী হয়, সে তত অল্প সময়ে স্বল্প দক্ষতায় অধিক জ্ঞান লাভ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারে এবং সঠিক জ্ঞানের ক্রমান্বয় চর্চা ও বাস্তব প্রয়োগ মাধ্যমে অন্যকেও পথ প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়।

কোন নারীর স্মরণশক্তি উন্নতমানের হলে তিনি বিভিন্ন জ্ঞান অর্জন করে লব্ধ জ্ঞান দ্বারা সন্তানকে পুষ্ট করতে পারেন। তাতে সন্তানটি উপকৃত হয়। এছাড়াও বহিঃকর্মজগতে সমুন্নত স্মরণশক্তি এবং প্রাপ্ত জ্ঞান যথেষ্ট মর্যাদা লাভের সহায়ক হয়। যদি কেউ ভগবদ্গীতা ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক গ্রন্থাদি মনোযোগ সহকারে পাঠ করে জ্ঞানলোকে উদ্ভাসিত হয়ে নিজ স্মরণপটে সেই আলোক সযত্নে রক্ষা করতে পারেন, তাহলে যে কোন মানুষকে সঠিকপথে পরিচালিত করার গুণাদি অবশ্যই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হবে।

নারীর অন্যতম ঐশ্বর্য তাঁর বচন মাধুর্য। স্বরযন্ত্রের এক বিশেষ সূক্ষ্মতার কারণে পুরুষ অপেক্ষা নারীর কণ্ঠস্বর অধিক তীক্ষ্ণ ও সুরসমৃদ্ধ। একটি মানুষের ভাষাজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, রুচিবোধ, প্রাণবন্ততা-এই সবই প্রতিফলিত হয় তার কথনে। নারীর কণ্ঠস্বর জন্মলব্ধ সুক্ষ্মতাযুক্ত হয়ে তাঁর বাক্য হয় আরও স্পষ্ট, জোরালো ও আকর্ষণীয়। ব্যক্তিবিশেষে শিক্ষা, বুদ্ধিবৃত্তি, রুচিবোধ ইত্যাদি ভিন্ন হওয়ায়, দুটি মানুষের বচনভঙ্গী ভিন্ন হয়। তাই অন্যভাবে বলা হয়, একটি মানুষের অন্তর্নিহিত পরিচয় প্রকাশ পায় তার কথনে। কথার মাধ্যমে আমরা ভাববিনিময় করি, আন্তরিক বাক্যালাপ পরকে আপন করে, আবার কটুভাষণ আপনকে পর করে দেয়। বাক্য এমনই এক সম্পদ যার কল্যান-মাধুর্যে আমরা যে কোনও নতুন পরিবেশে সকলের খুব কাছের মানুষ হয়ে যেতে পারি। সুমিষ্ট কথার মাধ্যমে বিবাহের পর মেয়েরা নতুন পরিবারের সকলকে আপন করে নিতে পারে। কর্মজগতে সহকর্মী, সহপাঠী সকলের প্রতি সহমর্মী ও একাত্ম হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু দুঃখের কথা, বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে গিয়ে প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাবে নিজের ইন্দ্রিয়াদিকে
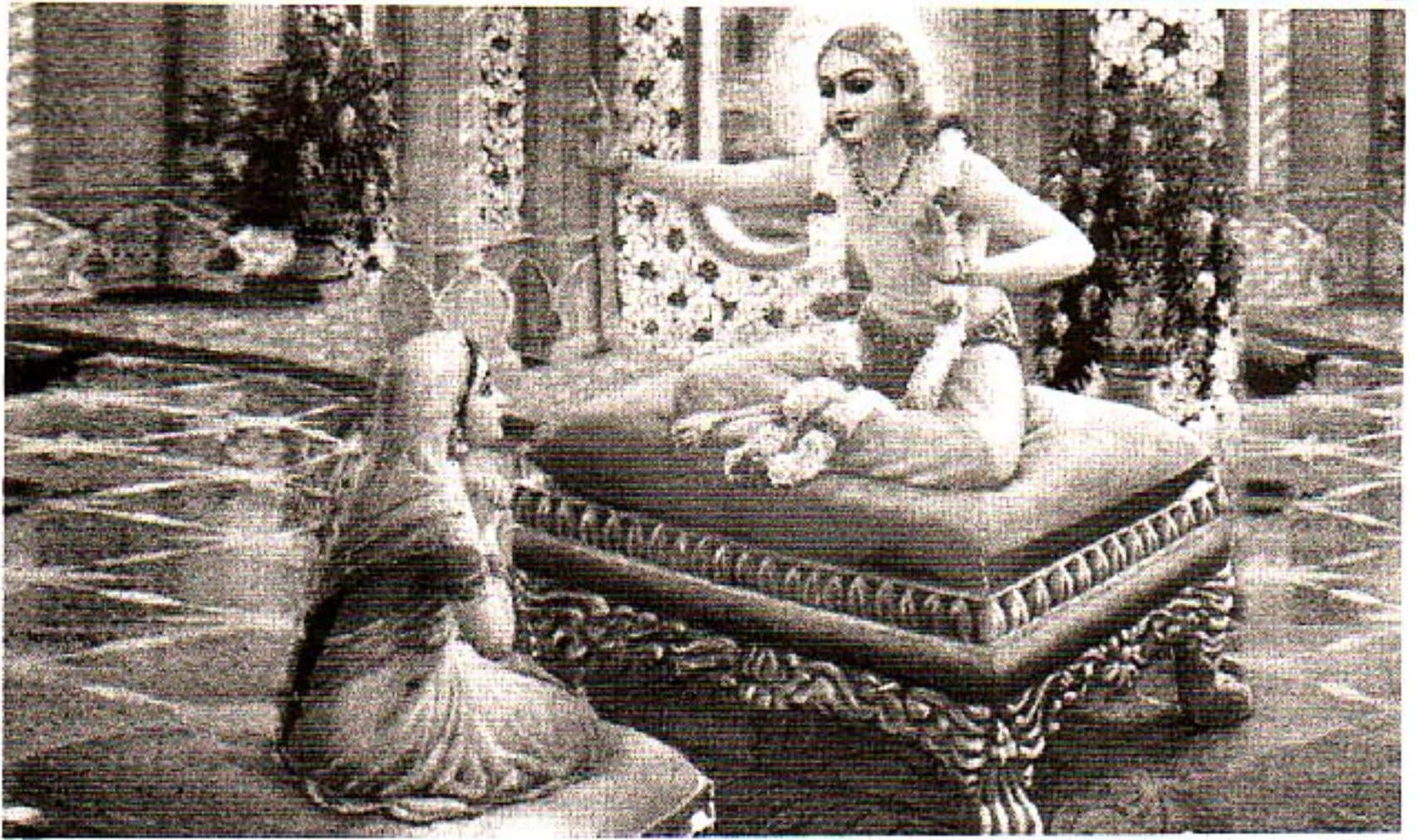
সমুচিত সংযত করতে না পেরে অনেকেই তার বচনভঙ্গীর অপপ্রয়োগ করে ভগবৎ-সৃষ্ট এই ঐশ্বর্যের মাধুর্য নষ্ট করে ফেলে, যা তার নিজের পক্ষে তো বটেই, অন্যের পক্ষেও অকল্যাণকর হয়ে ওঠে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, যখন কেউ ক্রোধ রিপুর বশীভূত হয়, তখন তার অন্তরস্থিত উত্তেজনা কথনে প্রকাশ পাবেই, যা সমগ্র পরিবেশ দূষণের পক্ষে যথেষ্ট। আবার একটা শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশে একজন আত্মাভিমানী, অহংকারী নারীর প্রবেশ ঘটলে তার বচন গুণে সেই পরিবেশের বিশুদ্ধতা ম্লান হয়ে সহজেই ভারী হয়ে যায়। অনেকে আবার আমোদমূলক রঙ্গরসিকতার আশ্রয় নিয়ে অন্যকে অকারণে যন্ত্রণা দান করে। এই ধরনের অপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকাই উচিত।

কিন্তু সচ্চিদানন্দ ভগবানকে উপলব্ধি করার কর্মে যত্নবতী সংযত একজন আদর্শ নারী অবশ্যই সদা আনন্দময়, তাঁর নির্মল অন্তঃকরণ প্রসুত বচন অন্যকে আনন্দদানেও সক্ষম। তিনি অবশ্যই ভগবৎ-কথা পাঠ কীর্তন, মানুষের অন্তরে সুপ্ত ভগবদ্ভক্তি জাগরণে, শিক্ষাবিস্তারে ও অন্যান্য কল্যাণকারী কার্যে এই ঐশ্বর্য প্রয়োগ করতে সচেষ্ট থাকেন। অন্যের নিকট হতে সম্মান আকাঙ্খা করা অপেক্ষা অন্যকে সম্মান করতে এই সম্পদ ব্যবহার করেন। ভগবৎ প্রদত্ত এই বাকশক্তির অপপ্রয়োগ তো দুর, তিনি তা অধিক প্রয়োগ থেকেও বিরত থাকেন, কারণ অন্তরের চিন্ময় আলোকদ্যুতিতে তিনি সর্বদাই স্নিগ্ধ, শান্ত, ভাস্বর। তাঁর উপস্থিতি পরিবেশে নির্মল বাতাবরণ সৃষ্টি করে।

নারীর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ বা ভগবৎ প্রদত্ত সদ্গুণ তাঁর বুদ্ধিমত্তা।' কোন একটি বিষয়বস্তু থেকে জ্ঞান আহরণ করার পর লব্ধ জ্ঞানকে স্থান, কাল, পাত্র প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিকভাবে প্রয়োগ করার ক্ষমতাকে বলে বুদ্ধিমত্তা। অর্জিত জ্ঞানের সময়োচিত উপযুক্ত প্রয়োগ কৌশল মাধ্যমে কোন মানুষ নিজেকে যে কোন পরিবেশে গ্রহণযোগ্য ও প্রতিষ্ঠিত করে তুলতে পারে।

কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমেই অন্তর্নিহিত প্রতিভা বিকশিত হয়। অনেক মেয়ের উচ্চপর্যায়ের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত প্রয়োগ কৌশল জানার অভাবে তা অব্যবহৃত, সমাদররহিত ও ব্যর্থ হয়ে যায়। আবার স্বল্প শিক্ষিতা একজন নারী তাঁর যথাযথ বুদ্ধিমত্তার বলে সামান্য জ্ঞানকে পুঁজি করেই সমাজে আদৃতা ও সার্থকনামা হয়ে ওঠেন। শুধু তাই নয়, বহু প্রতিকুলতাও জয় করা যায় এই বুদ্ধিমত্তার জোরে।

জ্ঞান ও বুদ্ধির যথাযথ মেলবন্ধনে উদ্ভাবনী কর্মকান্ড অগ্রগতি লাভ করে এবং সভ্যতা উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। একজন বুদ্ধিমতী নারী জানেন, ভগবদ্ভক্তি এবং ভগবানে শরণাগতিই প্রকৃত বুদ্ধি। তাই তিনি কোন অবস্থাতেই কৃষ্ণভক্তি ত্যাগ করেন না। সকল পার্থিব বস্তুর প্রতি নিস্পৃহ থেকে কাম, ক্রোধ, অহংকার ইত্যাদি আসুরিক রিপুকে দমনের মাধ্যমে সমস্ত ইন্দ্রিয়াদিকে সংযত করে নির্ধারিত কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করাই শ্রেষ্ঠ সাধন বলে তিনি স্বীকার করেন। তিনি একাধারে একাগ্রচিত্তে ভগবানের সেবা করে পরম তৃপ্তি লাভ করেন ও অন্য দিকে জাগতিক সকল কর্তব্যকর্ম যথাযথভাবে সম্পাদন করে এই ধরাধামের ঘরে ঘরে শান্তি ও আনন্দ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর সকল কর্মফল শ্রীকৃষ্ণে সমর্পন করেন এবং শাস্ত্রাচার অনুযায়ী নিজেকে সংশোধন করেন, আর তারপরে অন্যদের সংশোধন কার্যে অনুপ্রেরণা দান করে একটি সুন্দর গৃহ তথা নির্ভুল সমাজ গড়ে তোলার প্রয়াসী হন।

নারীর চরিত্রের আরও একটি বিশেষ গুণ-দৃঢ়তা। দৃঢ়তা অর্থাৎ মনের সেই শক্তি, যার দ্বারা তিনি মনঃস্থির করে তাঁর কর্মে ব্রতী হন এবং যে কোন প্রতিকুলতার মধ্যেও সেই কর্ম সম্পাদনের মনোবল বা সাহস দেখানোর ক্ষমতা রাখেন।

কোন কোন ব্যক্তি অহরহই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে, তার ফলে কোন কর্মেই সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ করতে পারে না। এই ধরনের অস্থির চিত্ততা তার নিজের উন্নতির পক্ষে প্রতিবন্ধক তো বটেই, অন্যেও তার উপরে কোন কার্যের দায়িত্ব দিয়ে ভরসা করতে পারে না। পরিণামে সেই উদ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তিটি নিজের উপরও আস্থা হারিয়ে ফেলে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, কেউ যদি ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহলে তাঁকে নিয়মিত মনোযোগ সহকারে, সর্বোপরি আরাধ্য ভগবানে সম্পূর্ণ ভক্তি ও বিশ্বাস রেখে একনিষ্ঠভাবে অভ্যাস চালিয়ে যেতে হবে। একদিন কর্তব্য পালন করলেন, অন্যদিন তা করলেন না-এরকম করলে চলে না। ভগবৎ ভজনাকারী ব্যক্তির মন যদি সতত ভয়, ক্ষোভ, দুশ্চিতা, ক্রোধ ইত্যাদি রিপুর প্রাবল্যে অস্থির হয়ে ওঠে, তাহলে বুঝতে হবে, ভগবান যে স্বয়ং ভক্তের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এই বিষয়ে তার মনে দৃঢ় প্রত্যয়ের অভাব আছে।

কেউ যদি কোন বিষয় শিখবে বলে মনঃস্থির করে, তাহলে একাগ্রতা সহকারে তা নিয়ে নিয়মিত পঠন-পাঠন, অনুশীলন ও প্রয়োগ করতে হবে, তবেই সেই বিষয় করায়ত্ব হবে। অন্যথায় নির্ভুল শিক্ষালাভ সম্ভব নয়। তবে যে বিষয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করবে তাতে আগ্রহ থাকা চাই এবং দেখতে হবে, বিষয়টি যেন কারও পক্ষে হানিকর না হয়ে সকলেরই কল্যাণকর এবং সৎ ও নৈতিক আদর্শের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। একজন দৃঢ়মনোভাবাপন্না নারী কোন পরিস্থিতিতেই তাঁর জন্যে নির্ধারিত কর্তব্যকর্ম হতে বিমুখ হন না, যে কোন সংকটে আপদে-বিপদে সংসারের সকল সদস্যকে সহযোগিতা সেবা এবং তাদের সুরক্ষাকর্মে সমগ্র দেহ মন দ্বারা নিষ্ঠা সহকারে ব্রতী হন।

একজন কৃষ্ণভক্ত নারীর মধ্যে নিম্নলিখিত চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করার দৃঢ়তা থাকা দরকার ঃ

১। নিয়মিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভজনা।

২। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতার্থে সকল কর্ম ও নৈবেদ্য নিবেদন করার মানসিকতা।

৩। ক্রোধ, অহংকার, ঘৃণা, ঈর্ষা, ভয়, লোভ ইত্যাদি রিপুকে বশীভূত করে, সকল প্রাণীর মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের অংশ বিদ্যমান এই জ্ঞানে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে সকলকে সম্মান করার প্রবণতা এবং সকলের অন্তরে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি জাগিয়ে তোলার সদিচ্ছা।

৪। কোন প্রতিকুলতার মধ্যেও কৃষ্ণভক্তি ত্যাগ না করা এবং জীবনে সমাগত সুখ দুঃখ, ভাল-মন্দ সবই ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই করুণা বলে গ্রহণ করার মনোভাব অর্জন।

৫। কৃষ্ণভক্তিকে কখনই ব্যবসায়িক বুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ না করা।

৬। পার্থিব বস্তুর উপর অহেতুক আকর্ষণ পরিহার করে, ইন্দ্রিয় সংযত করে নিষ্কামভাবে সকল কর্তব্য- কর্ম নিষ্ঠাসহকারে পালন করার মানসিকতা।

তবেই তিনি আত্মোপলব্ধির স্তরে উন্নীত হয়ে সংসারে সকলকে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে সক্ষম হবেন।

নারীর অন্যতম বিশেষ গুণ ধৈর্য। এই ঐশ্বর্য তাকে নম্র, ভদ্র, শিক্ষিত, স্নিগ্ধ করে তোলে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত ভগবদ্‌গীতা থেকে আমরা জেনেছি, মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ উভয়ই চক্রাকারে আবর্তিত হয়। এই দুই অবস্থায় যিনি অবিচলিত থাকেন অর্থাৎ সুখে আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হন না, দুঃখে শোকাকুলা হন না, তিনিই প্রকৃত ধৈর্য ও বুদ্ধির অধিকারী। সুখের আনন্দ ও দুঃখের কালো মেঘ সারাজীবন একই রকমভাবে অবস্থান করে না। তা দিন-রাত্রির মতোই আসে যায়। যিনি এই স্বাভাবিক সত্যটিকে হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তিনি সকল প্রতিকুলতার মধ্যেও স্থির থাকেন। প্রকৃতির তিনটি গুণ-সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণময়ী দৈবী মায়া মানুষের ইন্দ্রিয়াদিকে বিক্ষিপ্ত করা তথা মানুষকে অধৈর্য করার অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি, এই সকল আসুরিক শক্তি একজন শুদ্ধ ভক্তকেও সদা অধঃপতিত করার অপপ্রয়াস চালিয়ে যায়। তাই ভক্তিলতা বৃক্ষকে আশ্রয় করে স্বীয় মনোরূপী ইন্দ্রিয়কে সর্বাবস্থায় নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। কোন কিছু প্রত্যাশা না করে নিষ্কাম কর্তব্যকর্মে আত্মনিয়োগ করার ধৈর্যগুণেই একজন নারী সকলের আদরনীয়া হতে তথা ভগবানের অনুকম্পা লাভে সক্ষম হন।

বর্তমান যুগে নারীর মধ্যে এই সকল গুণাবলীর সঠিক সমন্বয় বুঝি দেখা যাচ্ছে না। ফলে, তারা কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্খার সাগরে নিমজ্জিত হয়ে বস্তুজগতের বন্ধনে রজ্জুবৎ বদ্ধ হয়ে আবর্তিত হচ্ছে। চিন্ময় দ্যুতি এবং আলোক সমুজ্জ্বল প্রকৃতপথের সন্ধান থেকেও তারা বঞ্চিত। সংযত মনের স্থির, শান্ত, নম্র, স্নিগ্ধ রমণী আজ আর তেমন দৃষ্ট হয় না। সকলেই বস্তু শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও প্রকৃত শিক্ষার আলোক হতে ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছে। কন্যা সন্তানদের নেই গুরুজনদের প্রতি সেরূপ শ্রদ্ধা, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্য ও সহযোগিতা করার মনোভাব ক্রমহ্রাসমান। মাতার মধ্যে মাতৃত্বও নারীত্বের সংজ্ঞা বহন করে না। সবই যেন ত্রুটিপূর্ণ। তাই আমরা উপলব্ধি করতে পারছি, নারীর মধ্যে ভগবৎ প্রদত্ত এই ঐশ্বর্যগুলির জাগরণ ও সঠিক বিকাশ আজ একান্ত প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা যথাযথ' গ্রন্থখানির মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বত্র নারীসমাজে সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।

(৭ পৃষ্ঠার পর)

সাময়িক পত্র প্রচার করছেন, তাঁরা কৃষ্ণসংকীর্তনই করছেন। প্রদর্শনী দেখিয়ে কৃষ্ণকীর্তন করছেন। নিজের আদর্শ আচরণের মধ্যে কৃষ্ণকীর্তন করছেন। হরিকীর্তন যাতে বাতাসে মিশে না যায় তজ্জন্য তাহা গ্রন্থে সংবদ্ধ হচ্ছে, পরবর্তী যুগের লোকেরাও এ কৃষ্ণকীর্তন শুনতে পাবে। কিন্তু যে কেবল নির্জনে ধ্যান করে মৌনী হয়ে থাকে, সে নিজের উপকারও খুব কম করতে পারে এবং অপরের উপকার বর্তমানেই করতে পারে না, পরবর্তী কালে ত' দূরের কথা।

কীর্তন জিনিষটি শ্রবণের উপর নির্ভর করে। কেবল সুর তাল-মান-লয়ের কসরৎ, যাহা লোকের ইন্দ্রিয়মাত্র তৃপ্ত করে-তাহা 'কীর্তন' নহে। 'কীর্তন' ভক্তিসিদ্ধান্তের প্রত্যেক তন্ত্রীতে আপনাকে ঐকতানে ঝঙ্কৃত করবে। যিনি সব ভেজাল জিনিষগুলিকে চুরি করে মানুষের মঙ্গল করেন, তিনিই হরি। সেই হরির কীর্তনেরই জগতে দুর্ভিক্ষ। পরা বিদ্যার মূল মালিক অপরা বিদ্যার হরণকারী। হরির কথা যত শুনা যাবে, তত সুবিধা হবে। হরি কখনও অনিত্য বস্তুকে আত্মসাৎ করেন না। তিনি ভেজাল জিনিষকে সরাইয়া দিয়া নির্মল চিদানন্দ সত্তাকে আত্মসাৎ করেন।

শ্রীনামামৃত

শ্রীপাদ শুভানন্দ দাস হলেন শ্রীল প্রভুপাদের একজন প্রিয় শিষ্য। শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন, শিষ্য শ্রীগুরুদেবের সেবা দুইভাবে করতে পারেন। বপুসেবা এবং বাণী সেবা। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর বিভিন্ন বইতে কৃষ্ণভাবনামৃত এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। শ্রীপাদ সুভানন্দ দাস প্রভুপাদের তিরোভাবের বেশকিছুদিন পর সেগুলো একত্রিত করে শ্রীনামামৃতঃ পবিত্র নামের সুধা (**Sri Namamrta : The nector of the Holy name**) শিরোনামে একটি বই সংকলন এবং সম্পাদনা করেন। বই থেকে গুরুত্বপূর্ন অংশ অনুবাদ করে ভক্তবৃন্দের অবগতির জন্য তুলে ধরা হলো।

অনুবাদক ঃ শ্রী মনোরঞ্জন দে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খ. কলিযুগে পবিত্র নাম জপের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূজিত হন।

১২। কলিযুগে বিদগ্ধ পন্ডিতেরা নাম সংকীর্ত্তনের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর "স্তবমালা" গ্রন্থে বলেছেন, যারা জ্ঞানীলোক, কলিযুগে তারাই সব সময় পবিত্র নাম জপের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজার্চ্চনা করে থাকেন। (উদ্ধৃত ঃ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদিলীলা ৩/৫৮)

১৩। কলিযুগে কৃষ্ণপূজার প্রক্রিয়া হল নামযজ্ঞ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বরূপদামোদর এবং রামানন্দ রায়কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "এই কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করার প্রক্রিয়া হল তাঁর পবিত্র নাম জপ করা, যাকে নামযজ্ঞও বলা যায়। যারা এরূপ কাজ করেন, তারা অবশ্যই বুদ্ধিমান। তারাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আশ্রয় পান। (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্যলীলা ২০/৯)।

গ. পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আবির্ভূত হয়ে নিজেই সরাসরি যুগধর্ম প্রবর্তন করেন।

১৪। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই চৈতন্য মহাপ্রভুরূপে যুগধর্ম নাম সংকীর্ত্তন প্রবর্তন করেন।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই চিন্তা করলেন ঃ "আমি যুগধর্ম" নাম সংকীর্ত্তন প্রবর্তন করবো। আমি নামের আনন্দে জগৎকে ভরে দেব। (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদিলীলা ৩/১৯)

(১৫) কলিযুগের ধর্ম হল ভগবানের পবিত্র নাম জপ-যা চৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তন করেন।

করভজন ঋষি মহারাজ নিমি-কে বললেন, "নিজের পরিকরগনকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গৌরবর্ণরূপে আবির্ভূত হয়ে এই কলিযুগে হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রবর্তন করেন। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি কলিহত জীবকে কৃষ্ণ ভজনার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। নন্দ মহারাজের ছেলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই কলিযুগে মানুষের কি করনীয় তা প্রবর্তন করেন। তিনি নিজেই চিন্ময় আনন্দে নাম জপ করেন এবং এভাবে সমগ্র জগৎ নামে উদ্বেলিত হয়। (শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা ২০/৩৪০-৩৪১)।

(১৬) কলিযুগের ভবসাগর পার হওয়ার শিক্ষা দেয়ার জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবারও চৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হন।

কলিযুগ আরম্ভ হওয়ার সামান্য পূর্বে–অর্থাৎ দ্বাপর যুগের শেষদিকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ন হন। তিনি ভগবদ্গীতার মাধ্যমে তাঁর অতি মূল্যবান নির্দেশনা প্রদান করেন। এই ভগবদ্গীতায়ই তিনি জীবকে তাঁর কাছে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পনের উপদেশ দেন। কলিযুগ আরম্ভ হলে বাস্তবে নানা কারণে মনুষ্যকুল কৃষ্ণের পাদপদ্মে আত্মসমর্পন করতে অক্ষম হয়। এই কারণেই প্রায় ৫ হাজার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর কাছে কিভাবে জীবকে আত্মসমর্পন করতে হবে, সেই শিক্ষা দেয়ার জন্য কৃষ্ণ নিজেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হন।

কৃষ্ণ নিজে যখন অবতীর্ণ হন তখন তিনি তাঁর বিভিন্ন নির্দেশ প্রদান করেন। আবার কৃষ্ণ যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপী ভক্ত হিসাবে আবির্ভূত হন তখন কিভাবে কলিহত জীব উদ্ধার পেতে পারে, তার উপায় বলে দেন। এই পথ বা উপায় হল 'হরেকৃষ্ণ' আন্দোলন। এজন্যই চৈতন্য মহাপ্রভু যখন আবির্ভূত হন, তখন তিনি যুগধর্ম সংকীর্ত্তন আন্দোলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কথিত আছে, এই সংকীর্ত্তন যুগের সময়সীমা হলো ১০,০০০ বছর। অর্থাৎ চৈতন্য যুগ থেকে আরম্ভ হয়ে এই সংকীর্তন আন্দোলন পরবর্তী ১০,০০০ বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এর অর্থ সংকীর্ত্তন আন্দোলন সমর্থন করে 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র জপের মাধ্যমে কলিহত জীবের মুক্তি হতে পারে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কিছুকাল পর থেকে কলিযুগ আরম্ভ হয়। এর সময়কাল ৪,৩২,০০০ সৌর বছর। এর মধ্যে মাত্র ৫,০০০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কলিযুগ শেষ হতে এখনও ৪,২৭,০০০ বছর বাকী আছে। এই ৪,২৭,০০০ বছরের মধ্যে ১০,০০০ বছর হল সংকীর্ত্তন আন্দোলনের সময় সীমা। এই সময় সীমার মধ্যে কলিহত বদ্ধজীবেরা 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র জপের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করে ভগবৎধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পাবেন।

'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র জপ সব সময়ই শক্তিময়। তবে কলিযুগে এর মধ্যে বিশেষ শক্তি নিহিত রয়েছে। কারণ কেবলমাত্র এই মহামন্ত্র জপ করেই কলিযুগের যাতনা থেকে জীব অতি সহজে মুক্তিলাভ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। তাই আমাদের কর্তব্য হল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসরন করে বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে শক্তিশালী করা। মানব সমাজের শান্তি ও উন্নতির জন্য এর চেয়ে কল্যাণকর আর কিছু নেই।

(১৭) ভগবানের পবিত্র নাম জপ হল এই যুগের পশুসদৃশ মানুষদের জন্য শ্রচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ

কৃপা। কৃষ্ণ ভক্তি অর্জন কোন সহজ বিষয় নয়। কারণ এই ভক্তির মাধ্যমেই যে কেউ কৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা লাভ করতে পারে। ভগবান তখন ভক্তের অধীন হয়ে পড়েন। কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু এই কৃষ্ণভক্তি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অকাতরে বিলিয়েছেন। এমনকি জগাই-মাধ্যই-এর মতো অতি পাপিষ্টদেরকেও তিনি কৃষ্ণভক্তি প্রদান করেছিলেন। নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই গেয়েছেন –

"দীনহীন যতো ছিল হরিনামে উদ্ধারিল।
তার সাক্ষী জগাই-মাধাই।"

ঐ সময় অবশ্য জগাই-মাধাই নামে দু'জন পাপিষ্ট ছিল। চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা এবং তাঁর শিক্ষার ফলে বর্তমানকালে কত শত জগাই-মাধাই যে উদ্ধার পেয়ে যাচ্ছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। চৈতন্য মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হলে যে কাউকে কৃষ্ণপ্রেম দিতে পারেন। চৈতন্যের কৃপা ছাড়া তাই কৃষ্ণপ্রেম লাভ সুদুর পরাহত। এজন্য ভগবদ্ গীতায় বলা হয়েছে, সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কশ্চিৎ কারোও সিদ্ধিলাভ হয় (গীতা ৭/৩)। এজন্য যে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত নয়, সে পশু-তুল্য। চৈতন্য মহাপ্রভু-এই যুগের বদ্ধজীবদেরকে তাই এই সুযোগ দিয়েছেন ঃ "কেবলমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কর এবং তাঁর দ্বারাই তোমার মুক্তিলাভ ঘটবে।" এই হল চৈতন্য মহাপ্রভুর অশেষ কৃপা। (কুন্তীদেবীর শিক্ষা)

(১৮) **জীব যাতে জীবনের সর্বোচ্চ পূর্ণ স্তরে উপনীত হতে পারে সেজন্য মহামন্ত্র জপের পদ্ধতি বিলানোর জন্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হিসাবে ধরাধামে আবির্ভূত হন।**

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের মাধ্যমে কলিহত জীব যাতে অতি সহজেই উদ্ধার পায়, সেজন্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার অহৈতুকী কৃপা বলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হিসাবে আবির্ভূত হন।

যে কেউ মহামন্ত্র জপের মাধ্যমে নিজেকে শুদ্ধ করে গড়ে তুলতে পারে। এইজন্য মহামন্ত্রকে পবিত্র- মৃও বলা হয়। মহামন্ত্র জপের ফলে মানব হৃদয়ে ভক্তিলতার বীজ বপন হবে। এভাবে তার সমস্ত পাপ দূরীভূত হতে পারে। (রাজবিদ্যাঃ জ্ঞানের রাজা)।

ঘ) কলিযুগে নামজপের মাধ্যমেই পূর্বাপর যুগসমূহের ধর্মীয় যাগযজ্ঞের ফলসমূহ অর্জন করা সম্ভব।

(১৯) কলিযুগে কেবলমাত্র ভগবানের দিব্যনাম জপের মাধ্যমেই পূর্বের তিন যুগের পারমার্থিক কর্মকান্ডের ফলাফল অর্জন করা সম্ভব।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে বলেন ঃ সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান করে, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ করে এবং দ্বাপরযুগে ভগবানের পাদপদ্ম বন্দনা করে যে ফল পাওয়া যেত, তার সবটাই কলিযুগে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। (শ্রীমদ্‌ভাগবতম্ ১২/৩/৫২)।

(উদ্ধৃতঃ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা ২০/৩৪৫)।

(২০) সত্যযুগে ধ্যানের মাধ্যমে। ত্রেতাযুগে যজ্ঞের মাধ্যমে অথবা দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম অর্চ্চন করে যা অর্জন করা সম্ভব ছিল, তার সবকিছুই ভগবান কেশবের মহিমা এবং জপ কীর্ত্তনের মাধ্যমে কলিযুগে অর্জন করা সম্ভব।

(বিষ্ণুপুরান ৬/২/১৭; পদ্মপুরান (উত্তরখন্ড ৭২/২৫) এবং বৃহৎ নারদীয় পুরান ৩৮/৯৭)।

(উদ্ধৃতঃ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা ২০/৩৪৬)

(২১) সনাতন গোস্বামীকে লক্ষ্য করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেন ঃ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর-এই তিনযুগে মানুষ বিভিন্ন ধরনের পারমার্থিক কর্মকান্ডে নিজেদেরকে ব্যাপৃত রাখতো। ঐসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা যে সব ফল লাভ করতো, কলিযুগে কেবলমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের মাধ্যমেই তারা একই ফলাফল লাভ করতে পারে। (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা ২০/৩৪৩)।

(২২) এই যুগে হরিকীর্ত্তনই আত্মোপলব্ধির একমাত্র বাস্তব পন্থা ঃ

কেউ যদি এই যুগে জীবনের সব ধরনের সমস্যার সমাধান পেতে চায়, তবে তাকে ভগবৎকীর্ত্তনের আশ্রয় নিতে হবে। সংকীর্ত্তন ব্যতীত এই যুগের সমস্যা সমাধানের আর কোন বিকল্প উপায় নেই। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, কেবলমাত্র পরম সত্য বিষ্ণুর ধ্যান করাই প্রশস্ত। কিন্তু বিভিন্ন যুগের জন্য ধ্যানের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে। সত্য যুগে যোগসাধনা করা সম্ভব ছিল। কারণ ঐ সময় মানুষ হাজার হাজার বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারতো। এই কারণে দীর্ঘদিন ধরে মানুষের পক্ষে যোগ সাধনার ব্যাপৃত থাকা সম্ভব ছিল। যেমন, সত্যযুগে বাল্মিকী মুনি ৬০ হাজার বছর তপস্যায় রত ছিলেন। কলিযুগে মানুষের আয়ু অতি কম। তাই সত্যযুগের মতো দীর্ঘকাল ব্যাপী যোগসাধনা করার প্রশ্নই উঠেনা, আর সেই সুযোগই বা কোথায় ? পরবর্তী ত্রেতাযুগে মানুষ বেদে নির্দেশিত বিভিন্ন ধরনের যাগ-যজ্ঞাদি সম্পন্ন করতো। আবার দ্বাপর যুগে মন্দিরে ভগবানের অর্চ্চনা করার প্রথা চালু হয়। বর্তমানযুগে হরিকীর্ত্তনের মাধ্যমেই–অর্থাৎ শ্রীহরি তথা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তনের মাধ্যমে একই ফলাফল লাভ করতে পারে। (আত্মজ্ঞানলাভের পন্থা)।

(২২) এই কলহপূর্ণ যুগে ভগবানের দিব্যনাম জপই আত্মজ্ঞান লাভের একমাত্র পথ।

কলিযুগ মানেই কলহপূর্ণ যুগ। এই যুগে প্রায় প্রতিটি জীবই পরস্পর বিদ্বেষ ও হানাহানিতে লিপ্ত। এ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হল, ভগবানের দিব্য নামের আশ্রয় নেয়া। ভগবানের দিব্যনাম জপ এবং তাঁর মহিমা কীর্ত্তনের মাধ্যমেই মানুষ কলিযুগের বিভিন্ন কলুষ থেকে নিজেকে সহজেই মুক্ত করতে পারবে।

– চলবে।

প্রভুপাদ পত্রাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের মূল্যবান চিঠি পত্রগুলি প্রকাশ করা শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার ছিল। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের অল্পকাল পরে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্যের চিঠি পত্রাদি ছাপানোর জন্য একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অর্থাদি ও অন্যান্য লোকবল সংগ্রহ করা হয়। তবে শ্রীল প্রভুপাদের অনেক শিষ্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন, প্রকাশনার ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা তারা করবেন। যদিও ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাষ্ট সমস্ত চিঠিপত্র যোগাড় ও সংরক্ষণ করার জন্য একটি উদ্যোগ গ্রহণ করে। তবে এই উদ্যোগ পুরোপুরি সফল হয়ে ওঠেনি। প্রায় দশ বৎসর পরে বিবিটি একটা নীতি নির্ধারণ করে।

প্রভুপাদের অপ্রকটের পরে ইসকন পরিচালনার নীতিমালা ও শিষ্যদের সঠিকভাবে শিক্ষাদানকালে এ চিঠিগুলি প্রকাশ করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠলো। মূলতঃ এ চিঠিগুলি ছিল একজন শুদ্ধভক্তের তাঁর শিষ্যদের প্রতি অনন্তকালের শিক্ষা। সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার হচ্ছে, ইস্‌কনের প্রতি প্রভুপাদের এমন অনেক নির্দেশনা এ সমস্ত চিঠিপত্রে রয়েছে, যা তাঁর অবর্তমানেও পথ দেখাবে।

ইস্‌কনের সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য এমন অনেক ভুলক্রটি খুব সহজেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র তাঁর ভবিষ্যত নির্ধারক সুদূর প্রসারী চিন্তাময় এ চিঠিগুলোর জন্যই। অধিকন্তু এসমস্ত চিঠি পত্র থেকে নতুন প্রজন্মের ভক্তবৃন্দ শ্রীল প্রভুপাদের ব্যক্তিজীবন ও ভক্তিজীবনে একজন শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের পন্থা ও প্রকৃত কৃষ্ণভাবনামৃতের দিক নির্দেশনা দান করবে। তবে আশা করা যায়, এই চিঠিগুলি সকল শিষ্যের কাছে প্রশ্নাতিতভাবে প্রতিপাদ্য হবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, এ ধরনের একটি জার্নাল সমস্ত শিষ্যের কাছে একটি দূর্লভ প্রাপ্তি বলে পরিগণিত হবে।

চিঠিগুলোর কোন প্রকার পরিমার্জন এমনকি অশুদ্ধ বানান ব্যাকরনগত ক্রটি ও ভাষারীতিও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

এ চিঠিগুলো আর্কাইভে রক্ষিত হয়েছে শুধুমাত্র শিষ্য ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের গবেষণা কার্যে সহায়তা করার নিমিত্তে। আমাদের ধারণা যে, চিঠিগুলির সম্পাদনা ও পরিমার্জন করার কোন প্রয়োজন নেই। যদিও চিঠির শিরোনাম ও সম্বোধনগুলি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে শুধুমাত্র স্থান সংকুলান করার জন্য।

আমরা সেই সমস্ত ভক্তদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি, যাঁরা তাদের ব্যক্তিগত পত্রগুলি ও নিঃস্বার্থভাবে শ্রম দান করে এ প্রকাশনাকে সার্থক করে তুলেছেন। এখানে অনেকের নাম করতে হয়। তবে তাদের মধ্যে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে হয় নিশ্চিন্তা প্রভু, গোবিন্দ ভাষ্য প্রভু, রসমঞ্জুরী দেবী দাসী, অমৃতা দেবী দাসী যাদের অকুণ্ঠ সহযোগীতায় এই প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে-

প্রকাশক-
৫ই নভেম্বর, ১৯৮৬
শ্রীল প্রভুপাদের তিরোধান দিবস

প্রিয় ব্রহ্মানন্দ, হয়গ্রীব, কীর্ত্তনানন্দ
সৎস্বরূপ, গর্গমুনি, অচ্যুতানন্দ
ও জদুরানী,

তোমরা আমার শুভেচ্ছা জেনো, গুরু গৌরাঙ্গ-গীরিধারি-গন্ধর্বিকার আশির্বাদ তোমাদের উপর বর্ষিত হোক। আমার নিরাপদে পৌঁছানো এবং স্থানীয় ভক্তরা যে আন্তরিকভাবে আমাদের গ্রহণ করেছে, সে সংবাদ ইতিমধ্যেই পেয়েছ। মিঃ এ্যালেন গিনস্‌বার্ক ও আরো পঞ্চাশ ষাট জন আমাদের বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা জানায়। এছাড়া এপার্টমেন্টে পৌঁছানোর পরেই সাংবাদিকরা আমার আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হয়। 'ক্রোনিক্যাল' এবং 'এক্সামিনার' এরকম দুই তিনটা পত্রিকা ইতিমধ্যে রিপোর্টটি প্রকাশও করেছে। এরকম একটি প্রকাশিত রিপোর্ট আমি পাঠালাম। আমি ইচ্ছা করি রিপোর্টের ১০০০ হাজার কপি অফসেটে ছাপিয়ে, ১০০ কপি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানে পাঠাবে।

তোমরা আমার অনুপস্থিতি বিশেষভাবে অনুভব করছো। কৃষ্ণ তোমাদের শক্তি দান করবেন। শারিরীক উপস্থিতি হচ্ছে অপার্থিব ধ্বনি, যা সদগুরুর কাছ থেকে আসে, আর সেটাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই অপার্থিব ধারনা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। যদি আমার অনুপস্থিতি খুব বেশী অনুভব কর, তাহলে আমি ঘরের যে স্থানে বসি, সেখানে আমার চিত্রপট স্থাপন করবে, তাহলে তোমরা অনুপ্রেরণা লাভ করবে।

আমি বাড়িটির সর্বশেষ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন আছি। আমি চাই বাড়িটি ১৯৬৭ সালের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে উদ্বোধন হোক, আর এজন্য সব ব্যবস্থা খুব দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। আমি ডিক্‌টাফোনের জন্য টেপ এখনও পাই নাই। আমি গতকাল তোমাকে টেপগুলো পাঠিয়েছি। শ্রীমান নেপালকে আমার আশির্বাদ জানিয়ো।

শ্রীমান রায়রামা খুবই ভালভাবে প্রসাদ রন্ধন করে ভক্তদের বিতরণ করছে -কখনও ভক্ত সংখ্যা সত্তর আশি হয়ে যাচ্ছে। এটা সত্যিই খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক। আমার মনে হয় এই কেন্দ্রটি অচিরেই খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। মনে হচ্ছে সব কিছুই খুব আশাপ্রদ। আশা করি তোমরা সকলে আছ আমার পরবর্তী উত্তরের অপেক্ষায়।

তোমাদের স্নেহধন্য
এ.সি, ভক্তিবেদান্ত স্বামী

- চলবে

কৃষ্ণভাবনামৃতের মূল্য

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী কর্তৃক লিখিত অনুবাদক - শ্রী প্রনব সরকার

শ্রীধর স্বামী তাঁর কোন এক প্রবচনে সদ্ভিনা শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন-এই কথাটার তাৎপর্য হচ্ছে সদ্ভাবনাময় হওয়া, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভক্তদের আরো ধৈর্য্যশীল হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। পারমার্থিক বা ভক্তিজীবনে একজন সাধকের এটিই হচ্ছে পরম সেবার লক্ষ্য।

ধৈর্য্য সম্পর্কে শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ বলেন-আমাদের উচিত হবে, ঐকান্তিকভাবে ধৈর্য্য ধারণ ও আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হওয়া। ধৈর্য্য হচ্ছে প্রপত্তি স্থাপনের সবিশেষ লক্ষণ। ধৈর্য্য ব্যতীত আমাদের প্রপত্তি বা আত্মসমর্পণ প্রকৃতপক্ষে নিষ্কাম এবং অসম্পূর্ণ। সেকারনে আমাদের উচিত হবে কৃষ্ণভাবনামৃতের আদর্শগুলি পরিপূর্ণ ঐকান্তিসহকারে স্থাপন করা। বস্তুত; আমরা কিন্তু ফলাকাংখী বিশেষ কর্মীও নই। আমরা কৃষ্ণসেবাপোলক্ষ্যে ব্যবসা করার পক্ষপাতী নই। এই প্রসঙ্গে শ্রীনৃসিংদেব যখন ভক্ত প্রহলাদ মহারাজকে তাঁর কৃপা লাভের জন্য আহবান করেন তখন প্রহলাদ মহারাজ অবশ্যই তা গ্রহণ করতে পারতেন। বা অন্য যে কোন বর লাভ করতে পারতেন। কিন্তু প্রহলাদ মহারাজ বলেন, প্রভু আমি কোন অভিলাষ নিয়ে আপনার শরণাপন্ন হইনি। আমি আপনার প্রতি সুষ্ঠ সেবা প্রদান করার জন্য তা করেছি মাত্র, আমি কোন অভিলাষ নিয়ে তা করিনি, যার ফলস্বরূপ আমি কিছু লাভ করবো। আমি এটা করেছি যাতে আপনার প্রীতি উৎপাদন করতে পারি। আর ভগবান ভক্তের নির্মল চিত্ত সেবাই গ্রহণ করেন।

প্রকৃতপক্ষে যারা নারায়ণের ভক্ত, তাঁরা স্বর্গে অথবা নরকে নয়তো মুক্তিকামী হোক না তাতে কিছু যায় আসে না। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সেবা করা। আর সেকারনে একজন নির্মল হৃদয়ের ভক্তই একমাত্র কাম্য। কেননা যার হৃদয় নির্মল তার সেবাকার্য্যও ততই আনন্দদায়ক হবে।

সেজন্যই একজন ভক্ত কামনা করে যদি কৃষ্ণ তাকে স্বর্গে অথবা নরকে বা গোলোক অথবা বৈকুণ্ঠ, যেখানে পাঠাক না কেন-ভক্ত তা কামনা করে না। ভক্তের অভিলাষ হচ্ছে কি করে কৃষ্ণের প্রীতি বিধান করা যায়। শুধুমাত্র নির্মল হৃদয়ই হচ্ছে ভক্তের একমাত্র কামনা-যার দ্বারা ঐকান্তিকভাবে ভগবৎ সেবায় নিয়োজিত হতে পারে।

একজন ভক্ত এভাবে বছরের পর বছর শ্রবণ, কীর্তন ও কঠোর শ্রম দ্বারা দেহ, মন, সকলই অর্পন করে, কিন্তু তার অহংভাবের বিনাশ হয় না। কাম, ক্রোধ, পরশ্রীকাতরতা এবং গর্ব এইসব ভ্রমপূর্ণ ধারণা আমার রয়ে গেছে। কারণ, আমি একবার চেষ্টা করেছি, দু'বার করেছি ? আমি কতবার রাধা গোপীনাথের পোষাক পরিধান করিয়েছি ? কতবার আমি ১৬ মালা জপ করেছি? আমি কতবার প্রণতিপূর্বক বৈষ্ণবদের বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ? আমি কতগুলি গ্রন্থ বিতরণ করেছি ? কতবার আমি কৃষ্ণসেবাকল্পে ঝুঁকি নিয়েছি? কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রকৃত রহস্য আমি পৌছে দিতে পেরেছি ? আমি কতবার অসুস্থ হয়েছি কৃষ্ণসেবা দান করতে গিয়ে? তবে এখনও এসব সেবাকল্পে আমার হৃদয় বিশুদ্ধ হয়নি।

কৃষ্ণ মানে হচ্ছে ধৈর্য্য, আর এই করতে গিয়ে, আমি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হচ্ছি। কারণ আমার সেবার গুণমান ও উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে পালিত হচ্ছে কিনা ? যদি আমার সেবা বিশুদ্ধ না হয়, তাহলে সেবায় কিছু ত্রুটি থেকে যাবে, আর তা হবে অপরাধ। তাহলে আমাদের শুধু ধৈর্য্যশীল হলেই চলবে না-

যদি আমি বৈষ্ণব আচারগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ না করি তাহলে সেই ত্রুটির জন্য ফল ভোগ করতে হবে। সেবা অপরাধ এর ফলে একজন ভক্ত লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তার ফল ভোগ করবে।

আর সেকারনেই একজন ভক্তের উচিত হবে পুনঃপুনঃ তার সাধনার গুণগত মান-ভজন ও সেবা যাচাই করা।

আমি যদি এসমস্ত সেবা কৃষ্ণপ্রীতার্থে করি, গুরু প্রীতার্থে বা বৈষ্ণব প্রীতির জন্য করে থাকি অর্থাৎ এ সকল ভাব নিয়ে তা যথার্থ সুন্দরভাবে সম্পাদন করলেও যদি হাজার জন্মও লেগে যায়-তাহলেও তা অবশ্য কর্তব্য ও গ্রহনীয় হবে। কারণ তা শুধুমাত্র কৃষ্ণের প্রীতির জন্যই করেছি। তিনি আমাকে কৃপা করবেন, কেননা আমি তার দাস মাত্র।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ২০-২৯, ওহে পরমেশ্বর ভগবান- আমি ধনরত্ন চাই না, সুন্দরী স্ত্রীলোক চাইনা-আমি অনেক অনুগামী চাইনা-আমি শুধু তোমার অহৈতুকী কৃপা লাভ করে জন্মে জন্মে তোমার সেবা করতে পারি- কোন রকম শর্তছাড়া সেবা মানে হচ্ছে- ধৈর্য্যপূর্ণ ভক্তি সেবা। আর ভগবান যদি তা আমাকে কৃপা করেন- তা হলে এটাই হচ্ছে ভক্তের প্রার্থনা।

মন্মনা ভব মদ্ ভক্ত মদ্ যাজি মাং নমস্কুরু
মামেবৈষ্যসি সতং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে।। গীতা-১৮/৬৫

আমার কথা সর্বক্ষন চিন্তা কর-আমার ভক্ত হও-আমার উপাসনা কর এবং আমার পূজা কর-তাহলে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে।

শ্রীল প্রভুপাদ ধৈর্য্য এই শব্দটির তাৎপর্য খুব সুন্দরভাবে করেছেন-কৃষ্ণ আমাকে কৃপা করবেন কারণ আমি তাঁর সেবাকার্য্যে নিয়োজিত রয়েছি- এই আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হওয়া বিশেষ প্রয়োজন-তবে তার যথার্থ নিয়মগুলি যত্নের সাথে অনুসরণ করা একান্ত কর্তব্য।

যেমন, আমরা কৃষ্ণের উপাসনা করি, সর্ব দেবতার অধিষ্ঠান তাতে রয়েছে, এই ভেবে। সর্ব জীবে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান রয়েছে এই ভেবে জীবসেবা করবো। প্রত্যেক বৈষ্ণবের প্রতি সম্মান ও বন্দনা করবো যথার্থ ভক্তি দিয়ে।

ভগবানের শুদ্ধ নাম কীর্ত্তন করা, শ্রবণ করা এবং এভাবে ভক্তদের প্রতি ধৈর্য্য রক্ষা করে সম্মান ও সেবা দান করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। কখনও যেন তা পরিত্যাগ না করি- যদি তা করি, তাহলে বুঝতে হবে আমার ভক্তি যথার্থ হয়নি।

যদি আমার উদ্দেশ্য স্বচ্ছ হয়, তাহলে আমি নির্মল শুদ্ধ চিত্তে কৃষ্ণ সেবায় অগ্রসর হব অর্থাৎ এটাই হচ্ছে কৃষ্ণের সাথে আমার সম্বন্ধ। আর কখনও আমি তা পরিত্যাগ করবো না। আর এই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রকৃত মূল্য।

মাং চ মোহ ব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ গীতা ১৪/২৬॥

অনুবাদ ঃ যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন, এবং যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন।

পরীক্ষিৎ নামক রাজর্ষি সরস্বতী নদীর তীরে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে, এক শূদ্র রাজবেশ ধারণ করে একটি দণ্ডের দ্বারা অনাথবৎ একটি গাভী ও বৃষকে প্রহার করছে। বৃষটি শ্বেতপদ্মের মতো শুভ্রবর্ণ। শূদ্রের প্রহারে সে এমনি ভয়ভীত হয়ে পড়েছিল যে, মূত্র ত্যাগ করে কম্পিত হচ্ছিল এবং এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল। শূদ্রটি তাঁর পদে আঘাত করছিল। সুবর্ণখচিত রথে আরূঢ় হয়ে, ধনুর্বাণে সুসজ্জিত মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই শূদ্রকে বজ্রগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন– তুই কে ? বলবান হওয়া সত্ত্বেও তুই এই পৃথিবীতে আমার আশ্রিত অসহায়দের হত্যা করতে সাহস করছিস ? তার ফলে তোর যে অপরাধ হয়েছে, তাতে তুই বধের উপযুক্ত।

মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন বৃষটিকে জিজ্ঞাসা করলেন–আপনি কে? আপনি কি মৃণালশুভ্র কোন বৃষ, না কোনও দেবতা? আপনি তিনটি চরণ হারিয়েছেন, এবং মাত্র এক পদে নির্ভর করে বিচরণ করছেন। আপনি কি কোনও দেবতা বৃষরূপ ধারণ করে আমাদের ছলনা করছেন? হে সুরভীনন্দন, আপনার আর শোক করার প্রয়োজন নেই। নিম্নশ্রেণীর শূদ্রটিকে ভয় পাওয়ারও দরকার নেই। আর, হে গোমাতা! আপনিও আর রোদন করবেন না।

তিনি (মহারাজ পরীক্ষিৎ) সেই বৃষটিকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন – হে সুরভীনন্দন, কে আপনার তিনটি পা ছেদন করেছে? হে বৃষ, আপনি নিরপরাধ এবং সম্পূর্ণ সাধু প্রকৃতির; যে দুর্বৃত্ত নিরপরাধ জীবের প্রতি হিংসা করে অপরাধী হয়েছে, সে যদি স্বর্গের বর্ম-অলংকৃত সাক্ষাদ্ দেবতাও হয়, তবু আমি তার বাহু ছেদ করে ফেলব। এইভাবে মহারথী (সহস্র শত্রুর সঙ্গে এককভাবে সংগ্রাম করতে সক্ষম) পরীক্ষিৎ, ধর্ম এবং পৃথিবীকে সান্ত্বনা দান করে, অধর্মের কারণস্বরূপ কলিকে সংহার করার জন্য তীক্ষ্ণ খড়্গ গ্রহণ করলেন।

কলি যখন দেখলেন যে, রাজা তাকে বধ করতে উদ্যত, তখন ভয়ে বিহ্বল হয়ে সে তার রাজবেশ পরিত্যাগ করে তাঁর পদতলে অবনতমস্তকে নিপতিত হয়ে আত্মসমর্পণ করল। মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন, 'তুমি যখন কৃতাঞ্জলিপুটে আমার শরণাগত হয়েছ, তখন আমি তোমাকে বধ করব না, কিন্তু তুমি আমার রাজ্যের কোন স্থানে থাকতে পারবে না, কেননা তুমি অধর্মের প্রধান সহচর।' কলি বা অধর্মকে যদি রাজা বা রাষ্ট্রনেতারূপে আচরণ করতে দেওয়া হয়, তা হলে অবশ্যই লোভ, মিথ্যা, চৌর্য, অসভ্যতা, বিশ্বাসঘাতকতা, দুর্ভাগ্য, কপটতা, কলহ ও দম্ভ প্রভৃতি অধর্মসমূহ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাবে।

এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে কলি ভয়ে কাঁপতে লাগল। তরবারি হস্তে তাকে বধ করতে উদ্যত পরীক্ষিৎ মহারাজকে তখন তার কাছে যমরাজের মতো মনে হয়েছিল। তখন সে মহারাজ পরীক্ষিতকে এইভাবে বলতে লাগল–হে ধার্মিক-শ্রেষ্ঠ, আপনি এমন কোন স্থান নির্দেশ করুন, যেখানে আমি স্থিরচিত্তে আপনার আজ্ঞা পালন করতে পারি। কলির এই আবেদন শ্রবণ করে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাকে যেখানে দ্যূত ক্রীড়া, আসব পান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ এবং পশু হত্যা হয়, সেই সেই স্থানে থাকবার অনুমতি দিলেন। কলি (উক্ত চতুর্বিধ স্থান পাওয়া সত্ত্বেও) পুনরায় স্থান প্রার্থনা করলে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাকে সুবর্ণে বসবাসের অনুমতি দান প্রদান করলেন। কেননা যেখানেই সুবর্ণ সেখানেই মিথ্যা, মত্ততা, কাম এবং হিংসা বর্তমান। অধর্মাশ্রয় কলি, উত্তরানন্দন পরীক্ষিতের আজ্ঞা শিরোধার্য করে তাঁর দেওয়া সেই পাঁচটি স্থানে বাস করতে লাগল। অতএব যে মানুষ মঙ্গলময় প্রগতি আকাঙ্ক্ষা করেন, বিশেষ করে রাজা, লোকনেতা, ধর্মনেতা, ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসী–তাঁদের পক্ষে ঐ সমস্ত অধর্ম আচরণে লিপ্ত হওয়া কখনো উচিত নয়।

যত নগরাদি গ্রামে

জয় শচীনন্দন গৌরহরি

পাথারিয়া-সুনামগঞ্জ মন্দিরের শ্রীশ্রী রাধামাধব বিগ্রহ

পাথারিয়া মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ এবং শ্রীমৎ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ

পাথারিয়া-সুনামগঞ্জ মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ

পাথারিয়া-সুনামগঞ্জ মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকমন্ডলী

শ্রীশ্রী শচীমাতা স্মৃতি তীর্থে-মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথিতে ১০৮ মৃদঙ্গ সহযোগে সংকীর্ত্তন পদযাত্রা

খাগড়াছড়ি নামহট্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রীমৎ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ

শ্রীশ্রী শচীমাতা স্মৃতি তীর্থে-মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথিতে ১০৮ মৃদঙ্গ সহযোগে সংকীর্ত্তন পদযাত্রা

খাগড়াছড়ি নামহট্টের প্রধান সড়কের সুদৃশ্য গেইট

মৌলভীবাজার জগন্নাথ মন্দিরে ভাগবতীয় প্রবচন প্রদানে – অধ্যক্ষ শ্রী সর্বেশ্বর গোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী

বরিশাল-পিরোজপুরে ১লা বৈশাখে হরেকৃষ্ণ নামহট্টের নগর সংকীর্ত্তন

যত নগরাদি গ্রামে

ভারতীয় প্রত্নবিদ কর্তৃক পৃথিবীর সবথেকে পুরাতন শহরের আবিস্কার

নয়া দিল্লী ঃ ভারতীয় বিজ্ঞানীগন প্রত্নতাত্ত্বিক এক আবিষ্কারের উল্লেখ করেছেন যে, পৃথিবীর সবথেকে পুরানো শহরের বয়সকাল-খৃঃ পূঃ প্রায় সাড়ে সাত হাজার বছর। ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত সবথেকে পুরনো শহর যেটি প্রায় চার হাজার বছর পূর্বের বলে ধারনা করা হতো।

বিভিন্ন ধরনের কাঠের টুকরা, মাটির পাত্র ও হাড়ের জিবাস্ম ও কিছু নির্মান সামগ্রীর সন্ধানও পাওয়া গেছে ভারতের সুরাট নগরী থেকে কিছুটা দূরবর্তী স্থানে। এক সংবাদ সন্মেলনে এ তথ্য জানান ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্ত মন্ত্রী শ্রী মুরলী মনোহর যোশী।

আবিষ্কৃত কিছু নমুনা যেগুলি উদ্ধার করা হয়েছে, ভারতের জাতীয় সমুদ্র বিজ্ঞান বিদ্যালয় এই প্রত্নসমূহ সংগ্রহ করেছে, যেগুলির মধ্যে রয়েছে কাঠের গুড়ি। সেগুলি প্রায় সাড়ে সাত হাজার বছর পূর্বেকার। এই আবিস্কার থেকে প্রমানিত হচ্ছে যে, ভূমধ্য সাগরের **'কমবে'** নিকটবর্তী সবথেকে পুরনো সংস্কৃতির পরিচয় মেলে।

বর্তমানকালে ধারনা করা হচ্ছে, পুরনো শহরটি প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বেকার। বর্তমানে এটির অবস্থান ইরাকের নিকটবর্তী সুমার উপত্যকায়।

প্রাপ্ত তথ্যাদি ও বিভিন্ন বস্তুর জ্যামিতিক গঠন প্রণালী অনুযায়ী আমরা নিশ্চিন্তে বলতে পারি, ঐ সব অঞ্চলের মনুষ্য বসতির বয়স প্রায় সাড়ে নয় হাজার বছর বলে দাবী করেন রাজগুরু-যিনি একজন স্বাধীন প্রত্নতত্ত্ববিদ।

এই তথ্যাদি যদি পরিপূর্ণভাবে স্থাপন করা যায়, তবে এ যাবৎ প্রাপ্ত আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন হরপ্পা সভ্যতা স্থানচ্যুত করবে।

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) কর্তৃক পাথারিয়া শ্রীশ্রী রাধামাধব মন্দিরের দায়িত্বভার গ্রহণ উপলক্ষে বিশাল ধর্মসভা।

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী সুনামগঞ্জ জেলার পাথারিয়াস্থ শ্রীশ্রীরাধামাধব মন্দির আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) এর নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর উপলক্ষে এক মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইস্‌কন জিবিসি ও গুরুবর্গের অন্যতম শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজ। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন ইস্‌কন জিবিসি শ্রীল ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ, সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ জাফর সিদ্দিকী, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রী নীহার রঞ্জন দাস, অধ্যাপক শ্রী ননী গোপাল দাস, সিলেটের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রী সুপর্ণ দে, ধর্মজিৎ সিং, যুগধর্ম দাস সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জেলা ছাত্রদলের সভাপতি এ, টি, এম হেলাল, পাথারিয়া রাধামাধব মন্দিরের সভাপতি শ্রী অর্জুন তালুকদার, সম্পাদক শ্রী নিহার রঞ্জন দাস এবং আখড়া কমিটির সদস্য সমীর দাস। এবং আলোচনায় আরও অংশগ্রহণ করেন বৃদ্ধিগৌর দাস এবং অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনায় শ্রী তমালপ্রিয় গৌর দাস অধিকারী।

অনুষ্ঠান মালার মধ্যে ছিল ভাগবতীয় আলোচনা, হরিনাম সংকীর্তন ও ভজন কীর্তন, মহাপ্রসাদ বিতরণ। সন্ধ্যারতির পর শুরু হয় ধর্মসভা। ইস্‌কন বাংলাদেশ এর সাধারণ সম্পাদক শ্রী চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় প্রধান আকর্ষণ ছিল শ্রীল জয়পতাকা স্বামী আচার্যপাদ এবং শ্রীল ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজের ভাগবতীয় প্রবচন। ইস্‌কন জিবিসিদ্বয়ের প্রবচন শ্রবণ করার জন্য অনুষ্ঠানস্থলে প্রায় বিশ হাজার লোকের সমাগম ঘটে। সভার শেষ পর্যায়ে পাথারিয়া মন্দির কমিটির নেতৃবৃন্দ শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে ডিড্ হস্তান্তর করেন।

সভাশেষে শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ৬০ জন ভক্তকে হরিণাম এবং ১১ জন ভক্তকে গায়ত্রী দীক্ষা দান করেন। একই সাথে দু'টি বৈদিক বিয়ে এবং একটি অন্নপ্রাশনও অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান উপলক্ষে আগত সকল ভক্তবৃন্দকে সুস্বাদু কৃষ্ণপ্রসাদে আপ্যায়িত করা হয়।

১০৮ মৃদঙ্গ সহযোগে বিশাল সংকীর্তন পদযাত্রা

শ্রীশ্রী শচীমাতা স্মৃতিতীর্থ আনন্দধাম, বড়গাঁও, হবিগঞ্জে-শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি স্মরণে সংকীর্তন পদযাত্রাকে জনগনের মাঝে আরও বেশী ফলপ্রসূ ক'র তোলার লক্ষ্যে হবিগঞ্জের শ্রীশ্রী শচীমাতা স্মৃতি তীর্থ আনন্দধাম থেকে ঢাকা দক্ষিণ, সিলেট (মহাপ্রভুর পিতৃবাড়ি) পর্যন্ত ১৩৬ কি.মি. দীর্ঘ সংকীর্তন পদযাত্রা ১০৮ মৃদঙ্গ সহযোগে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত অগনিত ভক্তের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নানা রঙের ব্যানার, ফেস্টুন, পতাকায় হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রদর্শন ও ভক্তদের নৃত্যকীর্তন পদযাত্রাকে আরও বেশী আনন্দমুখর করে তোলে। সাথে সাথে যাত্রাপথে শ্রীশ্রী জগন্নাথ মন্দির (শ্রীমঙ্গল), কালীমন্দির (মৌলভীবাজার); ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রাত্রি যাপন কালে মঞ্চ অনুষ্ঠানে ভাগবতীয় আলোচনা, ভজন কীর্তন, মহাপ্রসাদ বিতরণ স্থানীয় দর্শক শ্রোতাদের কৃষ্ণভাবনামৃত হতে উদ্বুদ্ধ করে।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রী সর্বেশ্বর গোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, অধ্যক্ষ শ্রীশ্রী শচীমাতা স্মৃতিতীর্থ আনন্দ ধাম। সংকীর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন- শ্রী হরিপ্রেম দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী উদয় গৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী নিত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী রত্নেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী অচ্যুত হরিনাম দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী গৌরকিশোর দাস ব্রহ্মচারী এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে

এই যুগের সমস্যাদির পারমার্থিক পর্যালোচনা

–শ্রীঅশ্বিনী কুমার সরকার

স্মার্ত পন্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের শ্রাদ্ধবিধি এবং ইস্‌কনের দৃষ্টিভঙ্গি

বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির মুখপত্র সমাজ দর্পণ, শ্রাবণ-১৪০০ সংখ্যায় "প্রসঙ্গঃ ধর্ম, জাতিভেদ সমস্যা ও সমাধান ভাবনা" শীর্ষক একটি ধারাবাহিক রচনার সপ্তদশ পর্বে আমি সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে হিন্দু সমাজের শ্রাদ্ধের দিনভেদ প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছিলাম। উল্লিখিত পর্বে আমি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছিলাম যে, "হিন্দু সমাজে জাতিভেদ স্থায়ীরূপ লাভ করেছে, ধর্মের ভেতর ভেদ-বৈষম্য সৃষ্টি হওয়ার কারণে। ধর্মের মধ্যে, উপাসনা পদ্ধতির মধ্যে, শ্রাদ্ধের দিন ও আচার-ব্যবহারের যদি ভেদ থাকে, তবে তার প্রভাব সমাজ জীবনে পড়তে বাধ্য। তাই প্রথমে আমাদের প্রয়োজন এই ধর্মভেদকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা। তারপর প্রয়োজন তার প্রতিকার তথা সমাধানে ব্যবস্থা নেয়া।" আমি চলমান হিন্দু সমাজের বিদ্যমান ধর্মভেদকে তখন মোটামুটি ছয়টি ভাগে বিভক্ত করেছিলাম। তার মধ্যে প্রথম ভেদটিই ছিল শ্রাদ্ধের দিনভেদ প্রসঙ্গ। তবে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হল, সমাজ দর্পনে পচিশ পর্বের সে ধারাবাহিক রচনাটি আমি শেষ করতে পারিনি। কোন আপত্তি না উঠা সত্ত্বেও একুশ পর্ব প্রকাশিত হওয়ার পর সম্পাদক মহোদয় আমার লেখা প্রকাশ বন্ধ করে দেন ; যার ফলে সমাধান ভাবনার রূপরেখা সম্বন্ধে আমার অভিমত সমাজ দর্পণের সম্মানিত পাঠকদের আমি জানাতে পারিনি। আমার মতে, সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন। আর সমাজের ভিতর যদি কোন সমস্যাই না থাকবে, তা'হলে সমাজ 'সংস্কার নামের একটি জাতীয়ভিত্তিক সমিতি প্রতিষ্ঠার আর কী উদ্দেশ্য হতে পারে ? প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ ও অভিনিবেশসহকারে ভাববার বিষয়ও। সে যাহোক, দিন ভেদের প্রসঙ্গটি আমি তুলেছিলাম এভাবে, "দিন ভেদের কথা বলতে গেলেই শ্রাদ্ধের কথা এসে যায়। হিন্দু সমাজে একদল লোকের শ্রাদ্ধ ১১ দিনে, আর একদল লোকের শ্রাদ্ধ ১৩ দিনে,অন্য একদল লোকের শ্রাদ্ধ ১৬ দিনে, আবার কারও শ্রাদ্ধকার্য ৩১ দিনে সম্পন্ন হয়।" এ মতের সমর্থনে পুরোহিত দর্পনে যে একমাত্র শ্লোকটি সন্নিবেশিত হয়েছে তা হল ঃ

"শুধ্যেদ্ বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভুমিপঃ।
বৈশ্য পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি।।"

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ দশদিনে, ক্ষত্রিয় বারদিনে, বৈশ্য পনের দিনে এবং শূদ্র একমাস বা ৩০ দিনে শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ হওয়ার পরদিন তাই শ্রাদ্ধের দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে আমি প্রশ্ন তুলেছিলাম যে, শুচি বা পরিশুদ্ধির দিনের মধ্যে এ ভিন্নতা কেন ? সনাতন ধর্মাবলম্বী সমাজটা তো ঈশ্বরকেন্দ্রিক। পরম পিতা পরমেশ্বরের সন্তান হিসেবে সকল মানুষই সমান। একটি আদর্শ পরিবার যেমন পরিবারের কর্তা পিতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে এবং বড় ভাই ও ছোট ভাইয়ের মধ্যে গুণ তথা যোগ্যতাগত তারতম্য সৃষ্টি হলেও সন্তান হিসেবে তারা পিতার চোখে সর্বদা সমান বলে বিবেচিত হয়। আর পিতার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিও তারা সমানভাবেই ভোগ করে থাকে। ঠিক তেমনি ঈশ্বরকেন্দ্রিক সমাজে স্বাভাবিকভাবেই সকলে সমান ও ভ্রাতৃভাবাপন্ন। ধর্মতঃ সকলে যদি ভ্রাতৃভাবাপন্ন তথা সমপর্যায়ভুক্তই হয়ে থাকে তাহলে শ্রাদ্ধের দিনের মধ্যে এরূপ পার্থক্য করার যৌক্তিকতা কোথায় ? কোন শ্লোকের উদ্ধৃতি তুলে ধরাটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল তার যৌক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। বিশেষ করে যা সমাজে বিভেদ ও বিভ্রান্তি জন্ম দিতে পারে, তা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখার অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। অথচ, প্রচলিত রঘুনন্দনস্মৃতিভিত্তিক পুরোহিত দর্পনে তা পুরোপুরি অনুপস্থিত। গীতোক্ত বর্ণ, এমন কি পুরোহিতের সংজ্ঞা সম্পর্কেও কিছু বলা হয়নি। কিন্তু এর কারণ কী ? উল্লিখিত শ্লোক থেকে কি নানা মত, নান পথ উদ্ভবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়নি ? গরুড় পুরাণের ব্যাখ্যার সাথে উপরোক্ত শ্লোকের অর্থের কোন সঙ্গতিই নেই। গরুড় পুরাণ তো কোন উপপুরাণ নয়। অষ্টাদশ মহাপুরানের অন্তর্গত একটি অতি নির্ভরযোগ্য পুরাণ এটি। তাই এর গুরুত্ব কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। এ পুরানের উত্তর খন্ডে অন্তেষ্টিক্রিয়া, যমপুরীর বর্ণনা, শ্রাদ্ধবিধি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে কথিত হয়েছে। অথচ, স্মার্ত পন্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য ও তার উত্তরসূরিয়া গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষায় তা পুরোপুরি এড়িয়ে চলেছেন। পুরোহিত দর্পণে এরা মনগড়া বিধি-বিধান সংযোজন করে সমাজকে স্থায়ীভাবে বিভক্ত করেছেন। একমাত্র রঘুনন্দনের নিজের বচনের জন্য হাজার হাজার মানুষ সামাজিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে অন্য ধর্মে চলে গেছে। তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ-

আদেশ কোনটিই গ্রহণ করেননি, শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ্যবাদের হাতটাকে শক্তিশালী করার জন্যে। গীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ উপেক্ষা করে ধর্মের ছত্রছায়ায় সমাজকে শোষণ-শাসনের ব্যবস্থা করেছেন মাত্র। এমতাবস্থায় একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, পুরোহিত দর্পণে রঘুনন্দন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রাদ্ধের দিনভেদ বহাল রেখে আর যাই হোক হিন্দু সমাজের জাতিভেদ বিলোপ সাধন সম্ভব নয়।

পন্ডিত রঘুনন্দন গীতোক্ত বর্ণবিভাজনের অপব্যাখ্যা করেছেন। গীতার নির্দেশ হল মানুষ তার স্বভাবজাত গুণ ও যোগ্যতা অনুযায়ী স্ব স্ব কর্মে নিয়োজিত হবে। সমাজে যোগ্যতানুযায়ী স্বকর্মে নিয়োজিত না হওয়াটা অশাস্ত্রীয় এবং খুবই অন্যায়। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় ভক্ত অর্জুনকে নানাভাবে স্বকর্মে নিয়োজিত হতে উৎসাহিত করেছেন। এখানে স্বকর্ম-স্বধর্ম অর্থেই বুঝতে হবে। তবে এ স্বকর্ম ধর্ম হলেও এর সাথে সম্পর্ক স্বভাবজাত গুণ ও যোগ্যতার। আবার এমন কিছু কর্ম আছে, যা সকলের জন্যই প্রযোজ্য ও ধর্ম। সকলের তাতে পূর্ণ অধিকার আছে এবং এ অধিকার সকলের জন্য সমান। সেটা হল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা ও সেবাকর্ম-পারমার্থিক জগতের কর্ম। এ ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ ও যুবা-বৃদ্ধার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ পরম পিতা পরমেশ্বরের কাছে সন্তান হিসেবে, ভক্ত হিসেবে সবাই সমান। মন্দির তথা মিলনকেন্দ্রে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই। ঋগ্বেদে স্পষ্টভাষায় উল্লেখ আছে যে, ধর্মস্থানে সকলের মন্ত্র, সকলের মন, চিন্তা-চেতনা ও সঙ্কল্প এক হতে হবে। সকলের একসঙ্গে চলতে হবে। সেখানে শ্রাদ্ধের দিনের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করা হয় কীভাবে ? ব্রাহ্মণ ১১ দিনে শ্রাদ্ধ করতে পারলে অন্যেরা ১৩, ১৬ কিংবা ৩১ দিনে কেন তা করবে ? তারা ১১ দিনে কেন করতে পারবে না ? উল্লেখ্য, রঘুনন্দনের বিধি কেবল ঐক্যের পরিপন্থী নয়, চরম বেদবিরোধীও। 'অমৃতের সন্ধানে' পত্রিকার জুলাই-সেপ্টেম্বর'০৪ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রী পুষ্পশীলা শ্যামদাস ব্রহ্মচারী মহোদয় তাঁর "বৈষ্ণব অশৌচ বিচার এবং পালন বিধি" শীর্ষক নিবন্ধের মাধ্যমে তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রতিপন্ন করেছেন। আমি এজন্য তাঁকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সেবা যদি শূদ্রের ধর্ম হয় তবে কলিযুগে যারা জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ বলে দাবি করছেন, তারাও শূদ্র। সবাই পরমপিতা পরমেশ্বরের ভক্ত, সন্তান কিংবা সেবক। জনসেবা, সমাজসেবা, দেশসেবা ইত্যাদি শব্দও ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং সেবা নিকৃষ্ট কোন কাজ নয়। সমাজের স্বার্থে সমাজে বসবাসকারী সকলেই কোন না কোনভাবে একে অন্যের সেবা করে চলেছেন এবং সমাজের সুসদস্য হিসেবে এটাই স্বাভাবিক। বিষ্ণু যামল গ্রন্থে উল্লেখ আছে "অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্প হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।" অর্থাৎ 'কলির ব্রাহ্মণগণের কোন শুদ্ধতা নেই ; তারা শূদ্রের ন্যায় আচরণ করবে। অতএব কলিতে ব্রাহ্মণগণও শূদ্র ; আর শূদ্র তো শূদ্রই। গৌর সুন্দর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই তথাকথিত বর্ণবাদ বাতিল করে কলির প্রারম্ভে ঘোষণা দিয়েছেন, সকল মানুষই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবক। তাই আমাদের কর্তব্য, একই নিয়মে সকল পারমার্থিক ক্রিয়াকর্মাদি সম্পন্ন করা। এটি বেদবিরোধী কোন উক্তি নয়। ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের ১৯১ সূক্তে সেই আহবানই ধ্বনিত হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও শ্রাদ্ধের মন্ত্রাদি একই প্রকার। ১১ দিনের শ্রাদ্ধে যে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয় ; ১৩, ১৬ দিন ও ১ মাসের শ্রাদ্ধেও সেই একই মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। তাহলে সবাই ১১ দিনে শ্রাদ্ধ করলে দোষের হবে কেন ? হিন্দু সমাজে শ্রাদ্ধের এ দিনভেদ কি সমাজকে স্থায়ীভাবে বিভক্ত করেনি ?

শ্রাদ্ধের দিন সম্বন্ধে শাস্ত্রে কী আছে এখন তা দেখা যাক। অশৌচ বিষয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কিছু সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

"দশাহং শাবমাশৌচং সপিন্ডে সুবিধীয়তে।
জননেহিপ্যেবমেব স্যাত্তি পুনং শুদ্ধিনিশ্চিতাম্।"
(গড়ুর পুরাণ উঃ খন্ড ৬/১০)

অর্থাৎ সাপিন্ডদিকের মরনাশৌচ ১০ দিন পর্যন্ত। যারা নিপুনভাবে শুদ্ধির আকাঙ্খা করেন, তাদের পুত্রাদিজনেরই ১০ দিন অশৌচ পালন করে ১১ দিনে বা ১২ দিনে শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন করার বিধি। এর সমর্থনে আরও উক্তি রয়েছে গড়ুর পুরাণে। যেমন-"একাদশে, দ্বাদশে বা দিনে আদ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।"

(গড়ুর পুরাণ উঃ খন্ড ৬/৩ অর্থাৎ, একাদশ (১১) অথবা দ্বাদশ (১২) দিনেই প্রকৃতপক্ষে আদ্যশ্রাদ্ধের সুদিন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবারও বললেন,

"একোদিষ্টবিধানেন স্বাহা করেন বুদ্ধিমান।
কুর্যাদেকাদশাহঞ্চ শ্রাদ্ধং সর্বং প্রযত্নতঃ।।"

অর্থাৎ বুদ্ধিমান মানবের উচিত একোদ্দিষ্ট বিধানে স্বাহাকার মন্ত্র দ্বারা যত্নসহকারে ১১ দিনে বা ১২ দিনে শ্রাদ্ধ করা। যদি কোন ব্যক্তি পরলোকগত পিতামাতার সুখ প্রদান করতে চান কিংবা মঙ্গল কামনা করেন, তবে তার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি-

"দ্বাদশাহে কৃতং সর্বং কর্মং যাবত সাপিন্ডম।
বিশেষং কথায়ি য্যামিমৃতস্যৈব সুখ।।"

-'মৃত ব্যক্তির সুখপ্রদকার্য বলছি শ্রবণ কর। মরনের পরে ১২ দিনে সমস্ত কার্য সম্পূর্ণ করবে। এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ১১ দিনে বা ১২ দিনে উল্লেখ করেছেন। কারণ যদি একাদশ দিনে বিষ্ণুজয়ন্তী বা একাদশী তিথি উপস্থিত হয় তাহলে দ্বাদশ (১২) দিনে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করবে। কেননা বিষ্ণুজয়ন্তীতে বা একাদশীতে পিতৃপরুষগণ পাপান্ন গ্রহণ করেন না। স্মার্তবিধানের ১৩, ১৬ দিন ও ১ মাসের শ্রাদ্ধ বিধিসম্পন্ন নয়। গড়ুর পুরাণ উত্তর খন্ডে ৪০ শ্লোকে এ প্রসঙ্গে আরও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে,

"একাদশাহে প্রেতস্য যস্যোৎ সৃজ্যেত নো বৃষঃ।
প্রেতত্ব সুস্থিতং তস্য দত্তৈঃ শ্রাদ্ধশতৈরপিঃ।।"

অর্থাৎ, যে প্রেতের উদ্দেশ্যে ১১ দিনে বৃষোৎসর্গের মাধ্যমে শ্রাদ্ধ না হয়, তবে তার উদ্দেশ্যে শত শত শ্রাদ্ধ করলেও প্রেতের বিমুক্তি ঘটে না।

ভিন্ন ভিন্ন দিনে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হওয়ার বর্তমান রীতি ঋক্‌বেদের ১০ম মন্ডলের ১৯১ সূক্তের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কুল্লুকভট্ট টীকাসংবলিত মনুসংহিতার কেবল একটি শ্লোক (৫/৮৩) ব্যতীত আর সব শ্লোকের দশাহ শৌচের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। ৫/৮৪ শ্লোকে বলা হয়েছে, 'অশৌচের দিন সংখ্যা বৃদ্ধি করা সমীচীন নয়।' ৫/৬২ শ্লোকে আছে, 'মৃতাশৌচে অস্পৃশ্যত্বরূপ অশৌচ সকলেরই সমান ; কিন্তু জননাশৌচে কেবল মাতা-পিতারই অস্পৃশ্যত্ব হয়। এই অস্পৃশ্যরূপ অশৌচ মাতার দশ রাত্রি হয়ে থাকে। কিন্তু পিতা স্নান করলেই স্পর্শনীয় হন। ৫/৭৫ শ্লোকে আছে, বিদেশস্থ সপিন্ডের মৃত্যুসংবাদ যদি ১০ দিনের মধ্যে শোনা যায় তবে দশাহের মধ্যে যে ক'দিন বাকি থাকে সে ক'দিন মাত্র অশৌচ পালনের বিধি। ৫/৭৬ শ্লোকে আছে, দশদিন অতিক্রম করার পর যদি ঐ মৃত্যুসংবাদ শোনা যায় তবে শোনার পর তিন রাত্রি পর্যন্ত অশৌচ হয়। বছর অতীত হয়ে গেলে যদি মৃত্যুসংবাদ পাওয়া যায় তবে কেবল স্নান করে শুদ্ধ হতে হয়। ৫/৭৯ শ্লোকে আছে, দশাহ জননাশৌচ বা মরনাশৌচের মধ্যে পুনর্বার যদি কোন জননাশৌচ বা মরনাশৌচ হয় তবে প্রথমাশৌচের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়শৌচেরও অবসান ঘটে।

কুল্লুকভট্ট টীকাসংবলিত মনুসংহিতার ৫/৮৩ শ্লোক সমাজের মধ্যে স্থায়ী বিভেদ সৃষ্টি করেছে। অধিকন্তু তা ঋক্‌বেদের ১০/১৯১ সুক্ত এবং গড়ুর পুরাণের শ্রাদ্ধবিধির পরিপন্থী। আর বর্তমান জন্মগত ব্রাহ্মণত্বের ধারণাটাও সঠিক নয়। এটা প্রমাণের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণবংশেই জন্মগ্রহণ করেননি। ইস্‌কন ঐক্যের স্বার্থে তার প্রচার মাধ্যমে সে কথাটাই বার বার তুলে ধরছে। অমৃতের সন্ধানে'র জুলাই-সেপ্টেম্বর'০৪ সংখ্যার চিঠিপত্র স্তম্ভে তাই বলা হয়েছে, "১০ দিন অশৌচ পালনান্তে সকলের ১১ দিনে শ্রাদ্ধ মহোৎসব পালন করা কর্তব্য।"

এখন সমাজ সংস্কার সমিতি সম্পর্কে এখানে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতি ইস্‌কনকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, "সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অনেকেই এ দর্শনে বিশ্বাসী হতে পারছেন না। এরা (ইস্‌কন) মূল স্রোত থেকে পৃথক হয়ে নতুন দল বা সম্প্রদায় গড়ে তুলেছেন।" (দ্রষ্টব্যঃ সমাজ দর্পণ আষাঢ়-১৪১০, পৃঃ ৫৪৭) এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য, ইস্‌কন বংশানুক্রমিক বর্ণভেদ ও শ্রাদ্ধের দিনভেদ প্রথা বিলোপ করে সামাজিক ঐক্যের ভিত মজবুত করতে চাচ্ছে। এটা এর খুবই ইতিবাচক দিক। অনৈক্যের মূল কাঠামো সম্পূর্ণ বহাল রেখে কি সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা কোনভাবে সম্ভব? বংশানুক্রমিক বর্ণভেদ প্রথায় জাতিসংঘ তথা রাষ্ট্রসংঘের মৌলিক মানবাধিকার সনদ লঙ্ঘিত হয়; আর সেজন্য জাতিসংঘ তা বিলোপ করেছে। (যা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু করেছেন আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগে) উল্লেখ্য, প্রতি বছর ২১ শে মার্চ আন্তজার্তিক বর্ণবৈষম্যবিরোধী দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে সারা বিশ্বে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতির চোখে বর্ণবাদ তথা ব্রাহ্মণ্যবাদ হিন্দু সমাজের প্রধান সমস্যা হিসেবে ধরা পড়ছে না কেন ? ভারতের সংবিধানমতে ওখানকার জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণরাও হিন্দু হিসেবে গণ্য। তারা কি তার কথামতো দেবদেবীর পূজা করবে ? সাংখ্যচর্বাকরাই কি তা করবে ? হিন্দুত্বের স্লোগানের মাধ্যমে তিনি কীভাবে সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চান, যেখানে এর ভেতরটা বৈষম্যে ভরা। অথচ সমাজ দর্পণ আষাঢ়-১৪১০ সংখ্যায় তিনি হিন্দু পরিচয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উপরই গুরুত্ব আরোপ করলেন। এভাবে কি ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব ? আগামী ৫০ এমনকি শ' বছরে তা সম্ভব হবে ? সমাজের ভেতরকার (ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত) বাধাগুলি কি আগে অপসারণের কোন প্রয়োজন নেই ?

শ্রাদ্ধের দিনভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে ধর্মের ভিত্তিতে সমাজকে স্থায়ীভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। একাজটি করা হয়েছে তথাকথিত ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য যুগ যুগ ধরে বজায় রাখার জন্য। এ ক্ষেত্রে গুণ ও যোগ্যতার কোন মূল্যায়নই করা হয়নি। ধর্মের ভেতর এভাবে কৌশলে দুর্নীতি ঢুকিয়ে কিছু শাস্ত্রজীবী সমাজটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ধ্বংসের একেবারে শেষ প্রান্তে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে। আর এ জন্যই সমাজ দিন দিন দুর্বল হতে দুর্বলতর হচ্ছে, সঙ্কুচিত হচ্ছে। এখানে বলা দরকার যে, শ্রাদ্ধের দিন হিসেবে একাদশ দিনই প্রশস্ত ও শ্রেষ্ঠ (যদি একাদশী কিংবা বিষ্ণুজয়ন্তী সেদিন না হয়)। এজন্য গোষ্ঠীস্বার্থের কথা ভেবে দুর্নীতিগ্রস্ত শাস্ত্রজীবিগণ তাদের নিজ সম্প্রদায়ের জন্য সেদিনটিই বেঁছে নিয়ে অন্যদের জন্য নিকৃষ্ট কিংবা কষ্টভোগের জন্য বেশি দিন নির্ধারণ করে দিয়েছে। এটা খুবই অন্যায়। সত্য কথা বলতে কি, চলমান পুরোহিত দর্পণ কোন মৌলিক ধর্মগ্রন্থ নয়। সম্মেলন-মহাসম্মেলনে যে সব প্রস্তাব এ পর্যন্ত পাশ হয়েছে, তার কোন প্রতিফলনই এ পুরোহিত দর্পণে নেই। বর্ণ, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, বৈষ্ণব ও ব্রহ্মচারীর কোন সংজ্ঞাও এতে নেই। এর আমূল পরিবর্তন কিংবা সংশোধন ছাড়া সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার চিন্তা করা কি আদৌ সম্ভব ?

আমার প্রশ্ন, ধর্মীয় মন্ত্র, বিধি-বিধান কিংবা শ্রাদ্ধের দিন সবার জন্য কেন একই হতে পারবে না ? মহাপুরাণ ভাগবতশাস্ত্রে উল্লেখ আছে, এ ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা। আর নারী-পুরুষ ব্রহ্মাই সৃষ্টি করেন। সমাজে গোত্র নির্ধারণ করা হয় ঋষির নামানুসারে। বর্ণের উদ্ভব হয় পরবর্তীকালে গুণ ও কর্মানুসারে। সেকারণে বৈদিক যুগে একই পরিবারের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের অস্তিত্ব ছিল। এ বিভাজনের আসল উদ্দেশ্য ছিল সমাজে যে যেকাজের যোগ্য সে সেকাজ করবে; কিন্তু একজন সুপরিচালকের মাধ্যমে যাবতীয় পারমার্থিকক্রিয়া ও উপাসনাকর্মাদি সম্পন্ন করবে একই পদ্ধতিতে অথবা একসাথে।

পঞ্চরাত্র প্রদীপ

শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী তথা ষড়গোস্বামীগণের অর্চনা পদ্ধতির ভিত্তিতে
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক বিশ্বব্যাপী প্রবর্তিত
ইস্‌কন জিবিসি বিগ্রহ অর্চনা গবেষণা গোষ্ঠী সংকলিত

সেবা অপরাধ এড়িয়ে চলুন

ভক্তি সুধার অষ্টম অধ্যায়ে বিগ্রহ পূজার তালিকাবদ্ধ অপরাধ এড়িয়ে চলতে হবে। পদ্মপুরাণে প্রদত্ত চার শ্রেণীর অপরাধকে পুনর্বিন্যাস করে নিম্নে দেওয়া হল ঃ ১) পবিত্রতার অভাব, ২) শ্রদ্ধার অভাব, ৩) চেষ্টার অভাব, ৪) বিশ্বাসের অভাব। যদিও সব অপরাধই শ্রদ্ধার অভাব দ্বারাই বোধগম্য, তথাপি স্পষ্টতার জন্যই আমরা এর শ্রেণী বিভাগ করছি। নিচের তালিকায় আমরা যেখানে যেখানে দরকার সেখানে কিছু বিশেষ অপরাধের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা যুক্ত করেছি। এর কিছু ব্যাখ্যা উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত বৈষ্ণবদের কাছে আত্ম ব্যাখ্যামূলক ও স্পষ্ট। আবার কিছু ব্যাখ্যা অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থক প্রতিপন্ন হতে পারে। কিন্তু সাধারণ আদর্শ বোধগম্য হলে কেউ নিশ্চয়ই বিগ্রহ সমীপে অপরাধমূলক কাজ এড়াতে পারবে।

অপরাধ সম্পাদিত হয় দেহ, মন ও বচনের দ্বারা এবং প্রায় অধিকাংশই এড়ান যায় ছ'প্রকার প্ররোচনাকে সংযত করে (বাক্য, মন, ক্রোধ, জিহ্বা, উদর ও জননেন্দ্রিয়) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর বিগ্রহমূর্তিতে উপস্থিত এই কথা স্মরণ করে ভক্ত সর্বদাই অপরাধ এড়াতে সজাগ। ভগবান পরম পবিত্র হওয়ায় সেবক অপবিত্র অবস্থায় তাঁর নিকট যেতে পারে না। তিনি সর্বাকর্ষক হওয়ায়, ভক্তের এমন পোষাক পরা উচিত নয়, বা এমন কাজ করা বা এমন কথা বলা উচিত নয় যা দ্বারা ভক্ত তার নিজের প্রতি অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। ভক্তকে সর্বদাই ভৃত্যের অবস্থানে থাকতে হবে, আর ভগবান থাকবেন পরম প্রভুর স্থানে। কাজেই ভক্তকে সঠিক পূজা দ্বারা ভগবানকে তুষ্ট রাখতে সকল প্রকারে চেষ্টাশীল হতে হবে। গুরুদেব ও শ্রীকৃষ্ণের ওপর ভক্তিপূর্ণ সেবার সকল অগ্রগতি নির্ভরশীল বলে ভক্ত এমন কোন কাজে প্রশ্রয় দেবে না, যা তার বিশ্বাসকে বিপদাপন্ন করে।

সেবা অপরাধ-পরিহারযোগ্য অপরাধ ঃ

শ্রীমদ্ভাগবতে (৪,২৪,৫৯) তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন ঃ মহামন্ত্র জপের সময় দশটি এবং বিগ্রহ পূজার সময় চৌষট্টিটি অপরাধ কেউ যদি করে তবে তা পরিহার করেই ভক্তিযোগ সম্পাদন করা যায়। কোন ভক্ত যদি কঠোরভাবে নিয়ম-কানুন মেনে চলে, তবে ভক্তিদেবী তার প্রতি অতীব সন্তুষ্ট হন এবং সেই সময় ভক্ত কোন বহিরঙ্গা শক্তি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না। ভক্তসঙ্গের দ্বারা যখন কারও হৃদয় পবিত্র হয়, ভগবানের নাম কীর্তন ও পূজার দ্বারা যখন অপরাধ কর্ম পরিহার করা হয়, তখন ভগবানের অপ্রাকৃত নাম, রূপ ও কার্যাবলী ভগবান কর্তৃকই প্রকাশিত হয়।

দেহ ও মনে পবিত্রতার অভাব হেতু অপরাধ

১। হাত-পা না ধুয়ে কারও মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়।
২। প্রতিদিনই খুবই সযত্নে দন্তমঞ্জন করতে হবে।
৩। সারা গায়ে তেল মেখে বিগ্রহকক্ষে প্রবেশ ও বিগ্রহাঙ্গ স্পর্শ করা উচিত নয়।
৪। স্নান না করে কেউ বিগ্রহ স্পর্শ করবে না।
৫। রজস্বলা নারীকে কেউ স্পর্শ করবে না।
৬। যৌনসহবাসের পর সরাসরি কেউ মন্দিরে ঢুকবে না।
৭। শবদেহ স্পর্শের পর কারও মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়।
৮। মৃতদেহ দর্শনের পর মন্দিরে প্রবেশ অনুচিত।
৯। শ্মশানক্ষেত্র পরিদর্শনের পর মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়।
১০। অশৌচ অবস্থায় মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ।
১১। ঘর্মাক্ত অবস্থায় ভক্তের বিগ্রহ-পূজা করা উচিত নয়।

[এটা শ্রীবিগ্রহের সান্নিধ্যে থেকে পূজারী কর্তৃক পূজা করা বোঝাচ্ছে। অবশ্য গ্রীষ্মঋতুতে ঘর্মাক্ত না হয়ে যখন উপায় নেই তখনও শ্রীবিগ্রহের পূজার কাজ চালিয়ে যেতে হবে। পূজা বন্ধ করা উচিত নয়।]

১২। পূজায় নিরত থাকার সময় কারও মূত্রত্যাগ করা বা (পাকস্থলী) খালি করা ঠিক নয়। [খাদ্যাভাস কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, যাতে পূজায় বিঘ্ন ঘটিয়ে কাউকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে না হয়। তথাপি পূজার কাজ অপরিহার্যরূপে বাধাপ্রাপ্ত হলে পূজারীকে মনে মনে ভগবানের কাছে এর জন্য অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে এবং পূজা বন্ধ ও পুনরারম্ভের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। শ্রীবিগ্রহের স্নানের সময় কোন বাধা কঠোরভাবে পরিহার করতে হবে।]

১৩। আঙ্গুল অথবা নখের স্পর্শ পাওয়া জল দ্বারা শ্রীবিগ্রহের পূজা করা যাবে না।

১৪। মন্দিরের অভ্যন্তরে ক্রোধ প্রকাশ চলবে না। [অবশ্য যদি ভক্ত ও ভগবান আক্রান্ত বা আতঙ্কিত হন, তখন তাঁদের রক্ষা করার জন্য সর্ব প্রকারেই ক্রোধ প্রদর্শন করা যেতে পারে।]

শ্রদ্ধার অভাব বশত অপরাধ

১৫। শ্রীবিগ্রহের সামনে ঢেকুর তুলতে নেই। ("সুতরাং খাদ্যবস্তু সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সে মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে না।" ভক্তিসুধা, অধ্যায় ৮)

১৬। কেউ মোটর গাড়িতে, বা পাল্কীতে বা জুতা পায়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে না। [পিতা বা মাতা তার শিশু সন্তানকে দু'দিকে পা ফাঁক করে কাঁধে বসিয়ে কীর্তন কক্ষে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে উপস্থিত হল, সেটি উচিত নয়। শিশুকে কোন যানবাহনে চড়িয়ে মন্দিরে প্রবেশ করার সমতুল্যই এই ব্যাপারটা। যদি প্রয়োজন হয় তবে ছোট শিশুকে হাত ধরে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি খোঁড়া বা

দুর্বল হয়, তখন সে হুইলচেয়ার বা তত্তুল্য কোন গাড়ি নিয়ে কীর্তনকক্ষে গেলে অপরাধ হবে না।]

১৭। শ্রীবিগ্রহের সামনে মাথা নত করা অপরিহার্য। [দু'বার করে প্রণাম করতে হবে-একবার শ্রীবিগ্রহকে কাছে, আবার সম্মানীয় ব্যক্তি যেমন, গুরুদেব ও সন্ন্যাসীদের ঃ একবার দূর থেকে, যখন কেউ কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে প্রথম দেখে, এবং আবার কাছ থেকে, যখন সে কাউকে দেখে। এমন কি কেউ যদি মন্দির গৃহের বাইরে থেকেও শ্রীবিগ্রহকে দেখে, তবে তার তৎক্ষণাৎ নমস্কার প্রদর্শন করা উচিত।]

১৮। এক হাতে ভর দিয়ে মাথা নত করতে নেই। [কেউ যখন কাউকে অবনত মস্তকে প্রণাম জানায়, তখন মনে মনে তার হাতের দ্বারা প্রণম্য ব্যক্তির পদস্পর্শ করা উচিত। অকৃত্রিম শ্রদ্ধা উভয় হাতের দ্বারাই পদস্পর্শ করার দাবি রাখে। কেউ যদি কিছু বহন করে, তবে প্রথমে সেটা উপযুক্ত স্থানে রেখে তারপর প্রণাম জানাবে।]

১৯। শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে কাউকে পরিক্রমা করা উচিত নয়। ("মন্দির পরিক্রমার পদ্ধতি হল শ্রীবিগ্রহের ডান হাতের পাশ থেকে পরিক্রমা শুরু করে ঘুরে আসতে হবে। মন্দির পরিকাঠামোর বাইরে অন্ততপক্ষে প্রতিদিন তিনবার করে এই পরিক্রমণ কার্য সম্পাদন করতে হবে।" ভক্তিসুধা ৮ম অধ্যায়।)

২০। শ্রীবিগ্রহের সামনে কেউ যেন পা ছড়িয়ে না দেয়।

২১। বিগ্রহের সামনে কেউ যেন তার হাতের দ্বারা গোড়ালি, কনুই বা হাঁটু ধরে না বসে।

২২। শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের সামনে কারও শয়ন করা উচিত নয়।

২৩। শ্রীবিগ্রহের সামনে প্রসাদ গ্রহণ অনুচিত।

২৪। শ্রীবিগ্রহের সামনে তাম্বুল চর্বণ করা অনুচিত।

২৫। শ্রীবিগ্রহের সামনে বাতকর্ম করা উচিত নয়।

২৬। শ্রীবিগ্রহের দিকে পিছন ফিরে বসা উচিত নয়।

২৭। শ্রীবিগ্রহের সামনে কোন ভিখারীকে ভিক্ষা দেওয়া উচিত নয়।

[ভিক্ষুককে দান করার সময় সেই ব্যক্তির নিজেকে সমগ্র জীবের মিত্র হিসাবে দেখার প্রবণতা জন্মে। এই মনোভাব শ্রীবিগ্রহের সামনে কারও প্রদর্শন করা ঠিক নয়।]

২৮। পূজা-পাঠের সময় নীরবতা ভঙ্গ করা উচিত নয়। [সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত মন্দির দর্শন করার সময়, গৃহীদের সজাগ থাকতে হবে এইজন্য যে, তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেন শ্রীবিগ্রহের সামনে অন্য ভক্তদের বিঘ্ন না ঘটায়। মন্দিরে যখন কেউ কৃষ্ণকথা, নাম জপ অথবা কীর্তন করে, তখন যেন মন্দিরের নীরবতা ভঙ্গ না হয়।]

২৯। শ্রীবিগ্রহের সামনে পরস্পর কথোপকথন করা উচিত নয়। [এই আদেশ পূজার্চনা চলাকালীন বিশেষ করে প্রজল্প কথনের বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ।]

৩০। বিগ্রহের সামনে অন্য কারও প্রশংসা করা উচিত নয়।

৩১। শ্রীবিগ্রহের সামনে খুব উচ্চস্বরে কথা বলা অনুচিত।

৩২। শ্রীবিগ্রহের সামনে কারও কান্না বা চিৎকার করা উচিত নয়।

৩৩। শ্রীবিগ্রহ সম্মুখে খুব কর্কশ কথা বলা বা কাউকে তিরস্কার করা উচিত নয়।

৩৪। বিগ্রহের সামনে কারও নিন্দাও করতে নেই।

৩৫। ভগবানের নামে শপথ করা উচিত নয়। [বিগ্রহের সম্মুখে ব্রত উদ্‌যাপন করতে গুরুদেবের আদেশ অনুসরণ করতে (আরম্ভ হিসাবে) অথবা দায়িত্ব গ্রহণ করতে (যেমন বিবাহে) ভক্তরা শ্রীবিগ্রহের সামনে শপথ গ্রহণ করে।]

৩৬। কারও বিগ্রহের সামনে কলহ বা লড়াই করা উচিত নয়।

৩৭। বিগ্রহের সামনে নিজের প্রশংসা নিজে করা অনুচিত।

৩৮। শ্রীবিগ্রহের সামনে পশুলোমের কম্বল পরা উচিত নয়।

৩৯। রক্তবর্ণ অথবা নীল বর্ণের, বা অধৌত পোশাক পরে কারও মন্দিরে প্রবেশ করা অনুচিত। [ভক্তকে এমন কোন পোশাক পরা উচিত নয় যা শ্রীবিগ্রহের পরিবর্তে তাঁর নিজের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। সাধারণভাবে বলা যায় শ্রীবিগ্রহকক্ষে উজ্জ্বলবর্ণের পোশাক পরিহার করা উচিত। অধিকন্তু বলা যায় যে গাঢ় নীল বর্ণের পোশাক শ্রীমতী রাধারাণীর এবং রক্তবর্ণের পোশাক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় পোশাক। অতএব বিশেষ করে সরাসরি বিগ্রহ কক্ষে তাঁদের উপস্থিতিতে এই সব বর্ণের পোশাক পরা অনুচিত।]

৪০। কারও ললাটে তিনটি রেখা দ্বারা তিলক অঙ্কিত করা উচিত নয়।

৪১। অভক্তের সামনে কেউ যেন বিগ্রহপূজা না করে। [শ্রীবিগ্রহ যখন শোভাযাত্রায় বার হন, তখন তিনি উপস্থিত সকলকে দয়া বিতরণ করেন। সেই সময় তাঁর পূজায় কোন সীমাবদ্ধকরণ থাকে না। যাই হোক, ভগবান যখন মন্দিরে থাকেন, তখন তিনি ভক্তদের দ্বারা পূজিত হন। যে সব অতিথি মন্দিরে আসেন তাঁরা আরতি উৎসব দেখতে পান। পূজার অন্যান্য দৃশ্য অবশ্যই বন্ধ পর্দার আড়ালে সম্পাদিত হবে।]

প্রচেষ্টার অভাব হেতু অপরাধ

৪২। সামর্থ্য অনুযায়ী শ্রীবিগ্রহের পূজা করতে হবে।

["ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, কোন ভক্ত যদি তাঁকে একটি পত্র ও এক বিন্দু জল অর্পণ করে, তবে তাতেই ভগবান সন্তুষ্ট হন। ভগবানকৃত এই ব্যবস্থা প্রণালী সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য, এমন কি দরিদ্রতম ব্যক্তির ক্ষেত্রেও। কিন্তু তাই বলে এটা বোঝায় না যে, যার ভগবানকে ভালভাবে পূজা করার মতো যথেষ্ট সঙ্গতি আছে, তারও এই পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত এবং শুধুমাত্র জল ও পত্র ভগবানের শ্রীচরণে নিবেদন করে তাঁকে তুষ্ট করার চেষ্টা করা উচিত। যথেষ্ট সঙ্গতি থাকলে, তার সুন্দর সজ্জা, সুন্দর ফুল, সুন্দর ভোজ্যদ্রব্য অর্পণ এবং সকল অনুষ্ঠান পালন করা উচিত। এটা এই নয় যে, কারও ভগবানকে শুধু সামান্য জল ও একটি পত্র সহযোগে সন্তুষ্ট করতে হবে, এবং তার নিজের জন্য ও নিজের ইন্দ্রিয় উপভোগের জন্য তার সমস্ত অর্থ ব্যয় করতে হবে।"]

(ভক্তিসুধা, ৮ম অধ্যায়)

৪৩। পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বিভিন্ন প্রকার উৎসব-অনুষ্ঠান যেমন, জন্মাষ্টমী ও রথযাত্রা আদি

উদ্‌যাপনে ব্যর্থ হওয়া উচিত নয়।

৪৪। ফুল অর্পণ না করে কোন গন্ধদ্রব্য অর্পন করা উচিত নয়। [সাধারণ রীতি হল এই যে পূজারীকে সঠিক মানের গহণা বা অস্থাবর সম্পত্তি দ্বারা পূজা করতে হবে। পূজারী মন্দিরে যে কোন সময়ে ধূপ জ্বালাতে পারেন। কিন্তু আরতির সময় যখন তিনি এটা করবেন, তখন তাঁকে অবশ্যই পুষ্পার্ঘ অর্পণ করতে হবে।]

৪৫। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন প্রকার ফল ও শস্য শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করতে হবে। [খামারবাড়িতে যখন যেমন ফসল উঠবে প্রথমে তা শ্রীবিগ্রহকে অর্পন করতে হবে। খামার বাড়ির শ্রীবৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খামারবাসীরাই নির্বাচন করবে শুধু নিজেদের জমিতে উৎপন্ন ফসল না, অতিথি প্রদত্ত ফল, শাক-সবজী ও শস্যদানা শ্রীবিগ্রহকে অর্পণ করা হবে।]

৪৬। কারও নীরবে গুরুদেবকে নমস্কার জানানো উচিত নয় বা অন্যভাবে বলা যেতে পারে, গুরুদেবকে প্রণাম নিবেদনের সময় উচ্চস্বরে প্রার্থনা করা উচিত।

৪৭। গুরুদেবের উপস্থিতিতে শ্রীবিগ্রহকে প্রশংসা নিবেদন করতে হবে। [সর্বাবস্থাতেই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আমরা যখন শ্রীবিগ্রহের পূজা করি, তখন আমাদের গুরুদেব বা ভগবান উপস্থিত থাকেন এবং ভগবানের সহায়ক হিসাবে আমরা তাঁর সেবা করি।

৪৮। শ্রীবিগ্রহ পূজায় কঠোরভাবে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে। ৪৯। শ্রীবিগ্রহের মন্দিরে প্রবেশ করতে হলে প্রথমে কোন শব্দ না করে প্রবেশ করা উচিত নয়। [মৃদু হাততালি দিতে বা ঘন্টী বাজাতে হয়।]

৫০। অন্ধকার ঘরে শ্রীবিগ্রহকে স্পর্শ করা অনুচিত। [বিগ্রহ-কক্ষ আলোকিত করতে পূজারীকে বিদ্যুতের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। শুধু তেল বা ঘি-এর প্রদীপে মন্দিরগৃহ আলোকিত হয় এটাই ঐতিহ্য।

৫১। খালি মেঝের ওপর বসে ভগবানের পূজা করা উচিত নয়। কোন বসার আসন বা কার্পেটের ওপর অবশ্যই বসতে হবে।

৫২। গন্ধবিহীন, ব্যবহারের অনুপযুক্ত ফুল দ্বারা শ্রীবিগ্রহের পূজা হয় না।

৫৩। অধৌত পাত্রের ফুল অর্পণ করা অনুচিত।

৫৪। অবৈষ্ণবের রান্না করা খাদ্য শ্রীবিগ্রহে অর্পণের অযোগ্য।

৫৫। কুকুর, বিড়াল বা অন্য ইতর প্রাণীর দৃষ্টি পড়েছে এমন খাদ্য শ্রীবিগ্রহে সমর্পণ করা উচিত নয়।

বিশ্বাসের অভাব হেতু অপরাধ

৫৬। শ্রীকৃষ্ণকে প্রথমে নিবেদন না করে কিছু ভক্ষণ করা ঠিক নয়।

৫৭। খাদ্য রন্ধনের পর প্রথমে শ্রীবিগ্রহকে নিবেদন না করে অন্য কাউকে দেওয়া অনুচিত। [বড় বড় উৎসবে শ্রীল প্রভুপাদ কোন অতিথিকে প্রসাদের জন্য অপেক্ষা করাতে চাইতেন না। অতএব যখন অনেক খাদ্য প্রস্তুত হচ্ছে তখন প্রসাদ বিতরণ ত্বরান্বিত করতে, যা প্রস্তুত হয়েছে তার থেকে প্রথমে কিছুটা নিয়ে শ্রীবিগ্রহকে নিবেদন করতে তিনি অনুমতি দিতেন। পরিশিষ্ট পদগুলি তখন সমর্পণযোগ্য হত।]

৫৮। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দেবদেবীর উপহাস করা উচিত নয়। (ভক্তিসুধা ৭ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য "দেবদেবী"।)

৫৯। ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে যে শাস্ত্র শিক্ষা দেয় তার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত নয়।

৬০। কোন প্রতিবাদী শাস্ত্র কারও প্রবর্তন করা উচিত নয়। [আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে শ্রীল প্রভুপাদের পুস্তকাবলীই হল প্রামাণ্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থ। অন্য কোন শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে প্রমাণ গৃহীত হলেও এটা ইস্‌কনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষার সমর্থনকারী প্রমাণ হিসাবেই শুধু প্রবর্তন করা উচিত।]

৬১। মরিজুয়ান বা গঞ্জিকা সেবন করা উচিত নয়।

৬২। কারও অহিফেন বা এর সমতূল্য মাদকদ্রব্য গ্রহণ করা অনুচিত। [বৈষ্ণবদের জন্য যেটা স্পষ্ট নির্দেশ, অন্য সকলের কাছে সেটা অবশ্যই স্পষ্ট নয়, বিশেষ করে এই অধঃপতনের যুগে। কৃষ্ণের মন্দির দর্শনকারী ব্যক্তিদের পরিহারযোগ্য অপরাধ সম্বন্ধে জানতে উৎসাহিত করতে হবে, যাতে করে তারা সচেতনভাবে সেগুলি এড়িয়ে চলতে পারে এবং তাদের দর্শন থেকে যথেষ্ট সুবিধা লাভ করতে পারে।]

মাঝে মাঝে আমরা যদিও বিভিন্ন বিগ্রহগণের "করুণার মাত্রা"-র পার্থক্য করি (উদাহরণ হিসাবে, আমরা শুনে থাকি যে রাধা-কৃষ্ণ থেকে গৌর-নিতাই "অধিকতর করুণাময়"), কারও ভাবলে চলবে না যে এই সব পার্থক্যগুলি কাউকে অপরাধ করতে স্বেচ্ছামতো কাজ করার অধিকার দিয়েছে। ভগবানের সকল বিগ্রহই সমানভাবে পূজার যোগ্য-এবং সেই কারণেই তাঁরা সমানভাবে উপযুক্ত আচরণ পাবার যোগ্য।

শ্রীবিগ্রহ উপাসনার প্রতিরোধী অপরাধসমূহ ঃ

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন ঃ

সঠিক সেবার পরীক্ষা এটাই। আমরা যদি বিগ্রহকে খুব হাসিখুশি মেজাজে দেখি, তবে সেটাই ভগবানের প্রতি আমাদের সেবার প্রশংসাপত্র। **সুতরাং সর্বত্রই আমরা বিগ্রহদের এইরূপ হৃষ্ট মেজাজে দেখব। যখনই আমরা বিগ্রহদের অন্য মেজাজে দেখব, তখনই সঙ্গে সঙ্গে আমরা অবশ্যই আমাদের ত্রুটির কথা বুঝতে পারব।** [শ্রীল প্রভুপাদের চিঠি, ২৭ মে, ১৯৭০]

কেউ অনিচ্ছাকৃতভাবে বিগ্রহের প্রতি অপরাধ করলে তাকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে তাঁদের নিকট প্রার্থনা করতে হবে এবং ভবিষ্যতে আর অপরাধ না করতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

নিম্নলিখিত শ্লোকটি সঠিক মেজাজের বিশদ ব্যাখ্যা করছে ঃ

অপরাধ সহস্রানি ক্রিয়ন্তেহর্নিশং ময়া।
দাসোহহম্ ইতি মাং মত্বা কৃষমস্ব মধুসূদন ॥

হে মধুসূদন, আমি দিনে রাতে হাজার অপরাধ করি। কিন্তু হে প্রভু, অনুগ্রহ করে আমাকে তোমার দাস বলে মনে করে দয়া করে সেগুলো ক্ষমা করে দাও।

পূজাপরাধ থেকে মুক্ত করতে শাস্ত্র কিছু প্রায়শ্চিত্তের সুপারিশ করেছে ঃ কেউ ভগবদ্‌গীতার একটি অধ্যায় পাঠ করতে, বিষ্ণু-সহস্রনাম-স্তোত্র জপ করতে পারে, শ্রীতুলসীদেবীর প্রার্থনা, অথবা তুলসী বীজ বপন করতে পারে। বিগ্রহ পূজার অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়ার অপর পন্থাটি হল শালগ্রাম শিলার অর্চনা। এই সকল কার্যাবলীর প্রয়োজনীয় বিষয় হল সকলকেই ভগবানের সেবক বলে মনে করা।

অদ্বৈতবাদ (মায়াবাদ) বনাম দ্বৈতবাদ (ভক্তিবাদ)

– শ্রী মনোরঞ্জন দে ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,ঃ-

"সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং জীবপ্রদঃ পিতা ॥

অর্থাৎ হে কুন্তি পুত্র, সমস্ত যোনিতে যে সমস্ত দেহ উৎপন্ন হয় ব্রহ্মরূপা প্রকৃতিই তাদের প্রসূতি এবং আমিই তাদের বীজ প্রদানকারী পিতা।

শ্রী বিষ্ণুপুরানে বলা হয়েছে ঃ

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেতজ্ঞাখ্যা তথাপরাঃ।
অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥"

অর্থাৎ ভগবানের শক্তি অনন্তঃ ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাঁর শক্তির প্রকাশ হয়। আমাদের সীমিত জ্ঞান/অনুভূতি দিয়ে তাঁর সেই শক্তি আমরা উপলব্ধি করতে পারি না।

(ঘ) মায়াবাদ (theory of illusion) মায়াবাদ বুঝতে হলে আমাদেরকে প্রথমে "মায়া" (illusion) বলতে কি বুঝায় তা জানতে হবে। সাধারন অর্থে "মায়া"বলতে ভ্রম (mistakes) বুঝায় অর্থাৎ যে জিনিস বা বস্তুর প্রকৃত অস্তিত্ব (real existence) নেই তাকে ভলি বা ভ্রমবশতঃ স্বীকার করে নেয়াকেই মায়া বলা যায়। এক কথায় যা নেই অথবা সত্য নয় তাকে গ্রহন বা স্বীকার করে নেয়ার প্রবৃত্তি/চিন্তাই হল মায়া।

শ্রীপাদ্ শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদকে মায়াবাদও বলা হয়। কারণ মায়াবাদী ভাষ্য তাঁর প্রবর্তিত অদ্বৈত বাদের একটি অবিভাজ্য অংশ। দুটিকে একই দর্শনের এপিঠ এবং ও-পিঠ বলা যায়।

সাধারণত একটি প্রচলিত বক্তব্য রয়েছে যে মায়াবাদ বলে ঃ ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। শঙ্করাচার্য্য হুবহু একথা বলেননি তা সত্যাকারণ আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে জগৎ অবলোকন করি তাকে তিনি পুরোপুরি অস্বীকার করেননি। শঙ্করাচার্য্যের মূলবক্তব্য হল এরূপঃ জড় জগৎ ব্রহ্ম থেকে পৃথক নয়। একে ভূল করে আমরা বহুরূপে এবং বহুআকারে দেখি। তাঁর মতে ব্রহ্ম সর্বাবস্থায় এক এবং অদ্বিতীয়। কোন অবস্থাতেই তিনি বহু হন না।

আপাতদৃষ্টিতে শঙ্করের উপরোক্ত বক্তব্যে একটি অসম্ভব অবস্থার উদ্ভব হয়। কারণ ব্রহ্ম যদি সব অবস্থায় এক থাকেন তাহলে বিশ্বে আমরা যে বহু বস্তু এবং নানারূপের সমাবেশ দেখি, তার সাথে ব্রহ্মের বিশুদ্ধ একক রূপের সঙ্গতি ঘটবে কি-ভাবে? এর উত্তরে শঙ্করাচার্য্যের যুক্তি হল ঃ বিশ্বের সব কিছুতেই ব্রহ্ম আছেন, ব্রহ্ম থেকে তা পৃথক নয়। বিশ্বের মধ্যে আমরা যে বহু সত্ত্বাকে (নানা বস্তু এবং নানা রূপ) দেখি সেটিই হল ভুল। অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বকে ঠিক মিথ্যা বলেন নাই, তবে বলেন যে, এই দেখাটাই ভুল। সবকিছুতেই ব্রহ্ম বিরাজমান। তাই সব কিছুকেই অভেদরূপে দেখাই উচিত। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের কারণে আমরা বিশ্বের সব কিছুতে ব্রহ্মকে না দেখে অথবা অনুভব না করে প্রতিটি বস্তু বা রূপকে স্বতন্ত্র বলে মনে করি। এরূপ বিচার-বিবেচনাকেই শঙ্করাচার্য্য ভ্রান্তিজনক বলেছেন।

ভুল দেখা বা উপলব্ধি দুই ধরনের হয়ঃ (১) নিরালম্বন ভ্রম–অর্থাৎ যা একেবারেই নেই (যার অস্তিত্বই নেই) তাকে দেখা বা স্বীকার করে নেয়া। যেমন আমরা স্বপ্নে অনেক কিছুই দেখি যার প্রকৃত অস্তিত্ব নেই। এই দেখাই হল নিরালম্বন ভুল বা দর্শন।

(২) সালম্বন ভ্রম– অর্থাৎ যা আছে তাকে ভুল করে দেখা বা উপলব্ধি করা। যেমন দঁড়িকে সর্প বলে ভ্রম করা অথবা শুক্তিকে (ঝিনুক) রজত খণ্ড (রৌপ্য) বলে ভুল করা ইত্যাদি।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য এই শোষাক্ত ভ্রমের কথাই বলেছেন তাঁর মায়াবাদ তত্ত্বে (theory of illusion)। তাঁর মতে- আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো জড়-জগতে যা অবলোকন করে, তা প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মই, তবে তাকে বহুরূপে দেখাটাই ভুল। অর্থাৎ যা বস্তুত এক তাকে আমরা বহুরূপে দেখি। তিনি বলেন, এই যে ব্রহ্মকে বহুরূপে দেখা তার কারণ হল মায়া। যেমন, অন্ধকারে দঁড়িকে সর্পরূপে ভুল করার কারণ হলো–আলোর অভাব। তাই মায়া হল এক ধরনের শক্তি যা আসল বস্তুর প্রকৃত রূপকে আবৃত করে (লুকিয়ে) রেখে তার বিকৃত রূপকে প্রকট করে তুলে ধরতে পারে। ফলে আমরা বস্তুর প্রকৃত রূপের পরিচয় পাই না। তাকে বিকৃত রূপে অবলোকন করি। অতি সংক্ষেপে বলা যায়, যে এক তাকে বহু রূপে দেখি। তাই এই বহুর জগৎ, নানারূপের জগৎ, একেবারে ভিত্তিহীন তা বলা চলে না। তা একরকম আছে, আবার নেই। এজন্য শঙ্কর একে সদসৎ বলেছেন। এজন্য তাঁর মতে দৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, তা ব্রহ্মই। কিন্তু তাকে দেখার ভুলে আমরা বহুরূপে দেখি।

বৈষ্ণব আচার্য্যেরা (দ্বৈতবাদীগন) যুক্তি দেন প্রকৃতি দুই ধরনের ঃ পরা প্রকৃতি এবং অপরা প্রকৃতি। জীবকে পরা অথবা উন্নত প্রকৃতির বলা হয়। কারণ সে পরমেশ্বর ভগবানের অনুচৈতন্য শক্তি। আর জড় বস্তু হল ভগবানের অপরাশক্তির প্রকাশ। তাই একে অপরা (নিকৃষ্ট) প্রকৃতি বলা হয়। একেই দ্বৈতবাদীরা মায়া বলেন।জীবকে আবার প্রান্তীয় শক্তিও (marginal energy) বলা হয়। কারণ চিৎ- শক্তি হলেও অনেক সময় জীব অপরা শক্তির (মায়া) অধীনস্থ হয়ে পড়ে। আবার অনেক সময় পরা বা চিৎশক্তির অধীনস্থ হতে পারে। সহজ কথায় জীব যেমন পরমেশ্বর ভগবানের সমীপে চলে যেতে পারে। আবার তেমনি জড়া প্রকৃতির অধীনস্থ হয়ে কামনা-বাসনায় জর্জরিত হয়ে কর্মানুযায়ী বিভিন্ন যোনীতে পরিভ্রমন করতে পারে। (চলবে)

রম্য রচনা

পথিক–গন্তব্য

– শ্রী অভাজন রায়।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পথিক ঃ আরে বন্ধো, খিচুড়িতে তোমার এতো অরুচি কেন ? খিচুড়িতো দেশের অর্বুদ জনগণের সুখাদ্য। খিচুড়ি তৈরীতে ঝামেলাও কম। ভুনা খিচুড়িরতো গুণের শেষ নাই। তাছাড়া পূজা পার্বনাদিতেতো খিচুড়ি প্রেসাদের ছড়াছড়ি। এমন স্বাদের খিচুড়ি তুমি তালগোল পাকিয়ে বিস্বাদ করতে চাও ?

গন্তব্য ঃ ধন্য ভাই, তোমার বরাহ ব্যবহার। কবে থেকে কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে জিলাপির মতো সোজা করে বলতে শিখলে? তোমার মাথায় দেখছি শুধু গোবর আর গোবর। আমি বল্লাম এক আর তুমি তার অর্থ কল্লে ডাল-ভাত নয়-একেবারে বাঙ্গালি খিচুড়ি। তোমার খিচুড়িতে কুতর্কের দূর্গন্ধ পাচ্ছি। তোমার অবস্থা ঠিক এই ব্যক্তির মতো-

বউমারা ঝগড়াটে পেঁচা নামে এক গৃহস্বামী ছিল। সে সকাল-সন্ধ্যা ভর দুপুরে অনর্থক প্রতিবেশীদের গায়ে পড়ে ঝগড়া করতো। তার এই ঔদ্ধত আচরনে অতিষ্ট হয়ে প্রতিবেশীরা আইন জারি করলো কেউ ঐ ঝগড়াটে পেঁচার সাথে কথা বললে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করা হবে। ভয়ে আর কেউ কথা বলে না পেঁচার সাথে। ওদিকে পেঁচা প্রতিবেশীদের গায়ে পড়েও ঝগড়া করতে না পেরে এক ফন্দি আটল। সে প্রতিবেশীর দ্বারে-দ্বারে ঘুরে-ঘুরে বলতে লাগল, 'ওহে ভাইসব; আজ-খিচুড়ি রান্না করবো-খিচুড়ি। সোয়াসের চাউল, সোয়াসের ডাউল, সোয়াসের তেল, সোয়াসের নুন, সোয়াসের লংকা, সোয়াসের হলদি, সোয়াসের আলু, সোয়াসের বেগুন একসাথে মিশিয়ে খেঁচুড়ি রান্না করবো। ওরে কি টেষ্টি খেচুড়ি হবে। খেঁচুড়ি রান্না করে দরজা বন্ধ করে এক একা জন্যের খাওয়া খেয়ে নেবো।' এভাবে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে তুলতে সে কথা বলেই চললো। তা শুনে পথিক ভদ্রলোক বললো, এই যে, ভাই সবকিছুই যদি সোয়াসের দাও তাহলে খিচুড়ি-বিচ্ছিরি হয়ে যাবে। অখাদ্য হয়ে যাবে। তা শুনে ঝগড়াটে পেঁচা রেগে-মেগে ভদ্রলোককে গালির স্বরে বললো, এই যে বরাহনন্দন, গোলামের পুত, আক্কেল হীনের সূত, আমার চাইল, আমার ডাইল আমি সোয়াসের দেই আর পাঁচসের দেই, আমি কি তোমার মাথায় রান্না করবো; না-কি তোমার মরা বাপের মাথার খুলিতে রান্না করবো ? আমার তেল, আমার নুন রান্না করবো-আমার চুলায় তোমার তাতে কি ? এই বলে ভদ্রলোকের পনেরটা বাজাল। সেই অবধি ঐ পেঁচার নাম হল 'সোয়াসের পেঁচা'। বন্ধু, দ্বিপদ মানব সমাজে এরূপ পেঁচার অভাব নেই। ধর্মবিষয়ে বহুমত বহুপথ সমর্থনকারীদের অর্থাৎ যারা ধর্মকে ইচ্ছামত ব্যাখ্যা দেয়, তাদের অবস্থাটাও ঠিক এই পেঁচার মতো। আর তুমিও তাদের মতোই কথাবার্তা বলছো। তাছাড়া তুমি যে উদারতার খিচুড়ি পরিবেশন করতে চাচ্ছ, কোন ভব্যব্যক্তি 'অমৃতের সন্ধানে' এসে কি খিঁচুড়ি খেতে চাইবে? আরে, অমৃত-কৃষ্ণভাবনার অমৃত। সেই অমৃত ছেড়ে কেউ কি গরল গিলে পটল তুলে যমের দক্ষিন দ্বারে যেতে চায় ?

পথিক ঃ কি সব আজে-বাজে কথা বলছো। যা কি-না দেবতাদেরও দুর্লভ সেই অমৃতের কথা বলছো তুমি তোমার এই আকাশ-কুসুম তত্ত্বকথা শুনলে আমার পিত্তিকোষ পর্যন্ত জ্বলে ওঠে।

গন্তব্য ঃ ওঠাই স্বাভাবিক। কথায় বলেনা-জন্ডিসের রোগী জগৎটাকে হলদে দেখে। তুমি সনাতন ধর্মের নামে উপধর্মের বেতন ধারীদের খপ্পরে পড়ার মত কথা বলছিলে। তাই তোমাকে 'সোয়াসের পেঁচার' পাঁচালি শুনালাম।

পথিক ঃ বেশ ভাই বেশ, আমার খেঁচুড়ি তোমার যখন ভাল লাগল না-তবে বিরানী-পোলাও, মাছ-মাংস খেতে নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। স্বামীজীতো বলেছেন, 'তোর যত খুশী মাছ-মাংস খা। যা পাপ হয় আমার হবে।, (বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১০ম, স্বামী শিষ্য সংবাদ)

গন্তব্য ঃ কিহে ! জ্যাঠামো আরম্ভ করলে না-কি। ধর্ম নিয়ে নানা মত নানা পথ-এর খিচুড়ি বানানো বাদ দিয়ে এবার আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা-জিহ্বাউদরউপস্থ ভাবনায় ডুব দিতে চাও বুঝি। আর সেই সাথে পাপের বোঝাটা চাপাতে চাও স্বামীজীর কাধে। বড় স্বার্থপর তো ?

পথিক ঃ আরে বল কি ? স্বামীজী আরও কি বলেছেন জানো- 'সারা দেশটা ঘোর তমোগুণে ডুবে যাচ্ছে। এখন চাই রজো-গুণের উদ্বোধন। এর জন্য মাছ-মাংস খাওয়ার দরকার, রজোগুণে বলীয়ান হওয়ার দরকার।' (বাণী ও রচনা)॥ আর তাতে যদি পাপ হয়-স্বামীজীর হবে। স্বামীজী স্বয়ং সেকথা ঘোষনা দিয়েছেন। তাতে আমার স্বার্থপরতা কোথায় ?

গন্তব্য ঃ তুমি স্বামীজীর দোহাই দিয়ে জনৈক ভন্ড গুরুর মত কথা বলছো। যিনি তার শিষ্যকে বিধান দিয়েছিল, 'রুহিতস্য কাতলস্য.......' রুই মাছ, কাতল মাছ, মাছের রাজা ইলিশ, কৈ, মাগুর, চিতল এই ছয়টি মাছ আমিষ নয়। এসব মৎস ভোজনে পাপ তাপের বালাই নাই। আত্মা যা চায় তাই খাও ; আত্মাকে কষ্ট দিলে ভগবান কষ্ট পাবে।' মূলতঃ এসবই সাধুতার নামে শয়তানি।

পথিক ঃ তাহলে তুমি নিরামিষ ঘাস-পাতা খাওয়ার কথা বলতে চাও। নিরামিষ খেলেই বোষ্টম হওয়া যায় ? ঠাকুর হওয়া যায় ?

গন্তব্য ঃ দ্যাখো ভায়া, ঘাস-পাতা খেলেও ছাগল-গরুর চোখে চশমা লাগাতে হয় না। আর, একটা কথা শোন, নিরামিষ খেলেই বৈষ্ণব হয় না। বেয়াক্কেলও হয়। ঠাকুর না হয়ে ঠ্যাটাও হয়। ছাগল ছাগলী, কপোত-কপোতিও হওয়া যায়। কেননা ওরাও নিরামিষ খায়। বৈষ্ণব-ঠাকুর হওয়া অত মুখের কথা নয়। আগে ভদ্র কুকুর হওয়া চাই, তারপর ঠাকুর। নৈতিকথা বোধ থাকা চাই, অতঃপর বৈষ্ণব ঠাকুর হওয়া আরও অনেক পরে। তবে সাত্ত্বিকাহার গ্রহন পারমার্থিক প্রগতির পথে প্রথম পদক্ষেপ। ভাই শোন, শিক্ষকের কর্ণ মর্দন ছাত্রের অসহ্য। তবু সহ্য করতেই হয়। তবেই রে মঙ্গল। আমার কথাও তোমাকে সহ্য করতে হবে। তোমার পরমহিতের জন্য আজ কিছু তত্ত্বকথা শুনতেই হবে তোমাকে। ধৈর্য্য ধর।

– চলবে।

শ্রীমদ্ভাগবত হল প্রাচীন ভারতের বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের সারাতিসার। পাঁচ হাজার বছর আগে মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস পারমার্থিক জ্ঞানের সারভাগ ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে এই অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। এখানে মূল সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রদত্ত শব্দার্থ, অনুবাদ এবং তাৎপর্যও উপস্থাপন করা হল। এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করা হচ্ছে।

প্রথম স্কন্ধ ঃ "সৃষ্টি"

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যাসদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদের নির্দেশ

শ্লোক-১

সূত উবাচ

অথ তং সুখমাসীন উপাসীনং বৃহচ্ছ্রবাঃ।
দেবর্ষিঃ প্রাহ বিপ্রর্ষিং বীণাপাণিঃ স্ময়ন্নিব ॥ ১ ॥

সূত-শ্রীল সূত গোস্বামী ; উবাচ-বললেন ; অথ-সুতরাং ; তম্-তাঁকে ; সুখম আসীনঃ-সুখে উপবিষ্ট ; উপাসীনম্-নিকটে যিনি বসে আছেন তাঁকে ; বৃহৎ-শ্রবাঃ-অত্যন্ত সম্মানিত ; দেবর্ষিঃ-দেবর্ষি ; প্রাহ-বলেছিলেন ; বিপ্রর্ষিম্-বিপ্রর্ষিকে ; বীণা-পানিঃ-যিনি তাঁর হাতে বীণা ধারণ করেন ; স্ময়ন্ ইব-স্মিত হেসে।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন ঃ তখন দেবর্ষি (নারদ) সুখে উপবিষ্ট হয়ে স্মিত হেসে বিপ্রর্ষিকে (বেদব্যাসকে) বললেন।

তাৎপর্য

নারদ মুনি তখন হাসছিলেন, কেন না তিনি মহর্ষি বেদব্যাসের অসন্তোষের কারণ ভালভাবেই জানতেন। বেদব্যাসের অসন্তোষের কারণ ছিল ভগবদ্ভক্তি-বিজ্ঞান পূর্ণরূপে প্রদানে তাঁর অক্ষমতা, যা তিনি ধীরে ধীরে বিশ্লেষণ করবেন। নারদ মুনি তাঁর সেই ত্রুটির কথা জানতেন এবং ব্যাসদেবের মনের অবস্থা তা সমর্থন করেছে।

শ্লোক-২

নারদ উবাচ

পারাশর্য মহাভাগ ভবতঃ কচ্চিদাত্মনা।
পরিতুষ্যতি শারীর আত্মা মানস এব বা ॥ ২ ॥

নারদঃ-নারদ ; উবাচ-বললেন ; পারাশর্য-হে পরাশর পুত্র ; মহাভাগ-মহা-ভাগ্যবান ; ভবতঃ-তোমার ; কচ্চিৎ-যদি হয় ; আত্মনা-আত্মজ্ঞান দ্বারা ; পরিতুষ্যতি-সন্তুষ্ট হয় কি ; শরীরঃ-দেহকে ; আত্মা-আত্মা ; মানসঃ-মনকে ; এব-অবশ্যই ; বা- অথবা।

অনুবাদ

পরাশর-পুত্র ব্যাসদেবকে সম্বোধন করে নারদ মুনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি কি তোমার দেহ অথবা মনকে তোমার স্বরূপ বলে মনে করে সন্তুষ্ট হয়েছ ?

তাৎপর্য

নারদ মুনি এখানে ব্যাসদেবের অসন্তুষ্টির কারণ ইঙ্গিত করেছেন। মহর্ষি পরাশরের পুত্র ব্যাসদেবের পক্ষে এভাবে বিষন্ন হওয়া উচিত নয়। এক মহান্ পিতার মহান্ সন্তানরূপে দেহ অথবা মনকে আত্মা বলে মনে করা তাঁর উচিত হয়নি। অল্পজ্ঞ মানুষেরা দেহ অথবা মনকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করতে পারে, কিন্তু ব্যাসদেবের পক্ষে সেটি করা উচিত হয়নি। জীব যতক্ষন পর্যন্ত না জড় দেহ এবং মনের অতীত বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের স্তরে অধিষ্ঠিত হচ্ছে ততক্ষন পর্যন্ত প্রসন্ন হতে পারে না।

শ্লোক-৩

জিজ্ঞাসিতং সুসম্পন্নমপি তে মহদদ্ভুতম্।
কৃতবান্ ভারতং যস্ত্বং সর্বার্থপরিবৃংহিতম্ ॥ ৩ ॥

জিজ্ঞাসিতম্-পূর্ণরূপে অনুসন্ধান করে ; সুসম্পন্নম্-সুসম্পন্ন ; অপি-তা সত্ত্বেও ; তে-তোমার ; মহৎ-অদ্ভুতম-মহৎ এবং অদ্ভুত ; কৃতবান্-রচনা করেছ ; ভারতম-মহাভারতম ; যঃ ত্বম্- তুমি যা করেছ ; সর্ব-অর্থ-সমস্ত অর্থযুক্ত ; পরিবৃংহিত-বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষন করা হয়েছে।

অনুবাদ

তোমার প্রশ্নগুলি ছিল পূর্ণ এবং তোমার অধ্যয়নও যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে, আর তুমি যে সমস্ত বৈদিক নির্দেশ বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করে মহৎ এবং অদ্ভুত মহাভারত রচনা করেছ সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য

জ্ঞানের অভাব অবশ্যই ব্যাসদেবের অসন্তোষের কারণ ছিল না, কেন না শিক্ষাকালে তিনি বৈদিক শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অনুসন্ধান করেছিলেন এবং তার প্রকাশ স্বরূপ বেদের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্তৃত বিশ্লেষণ করে তিনি মহাভারত রচনা করেছিলেন।

শ্লোক ৪

জিজ্ঞাসিতমধীতং চ ব্রহ্মযত্তৎ সনাতনম্।
তথাপি শোচস্যাত্মানমকৃতার্থ ইব প্রভো ॥ ৪ ॥

জিজ্ঞাসিতম্-পূর্ণরূপে বিবেচনা করে ; অধীতম্-উপলব্ধ জ্ঞান ; চ-এবং ; ব্রহ্ম-পরম-তত্ত্ব ; যৎ-যা ; তৎ-তা ;

সনাতনম্-নিত্য ; **তথাপি**-তা সত্ত্বেও ; **শোচসি**-অনুশোচনা করছ ; **আত্মানম্**-আত্মাকে ; **অকৃত-অর্থঃ**-অকৃতার্থ ; **ইব**-মতো ; **প্রভো**-হে প্রভু।

অনুবাদ

তুমি নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছ এবং তৎসংলগ্ন জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করেছ। তথাপি হে প্রভু, তুমি কেন নিজেকে অকৃতার্থ বলে মনে করে বিষাদগ্রস্ত হয়েছ?

তাৎপর্য

শ্রীল ব্যাসদেব রচিত বেদান্ত-সূত্র বা ব্রহ্মসূত্র হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের পরিপূর্ণ বর্ণনা, এবং তা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন বলে স্বীকৃত। তাতে নিত্য সনাতন বস্তুর পূর্ণ বর্ণনা রয়েছে এবং তা অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ। সুতরাং ব্যাসদেবের আধ্যাত্মিক পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। তা হলে তিনি অনুশোচনা করছেন কেন ?

শ্লোক ৫

ব্যাস উবাচ

অস্ত্যেব মে সর্বমিদং ত্বয়োক্তং তথাপি নাত্মা পরিতুষ্যতে মে।
তন্মূলমব্যক্তমগাধবোধং পৃচ্ছামহে ত্বাত্মভবাত্মভূতম্ ॥ ৫ ॥

ব্যাসঃ-ব্যাসদেব ; **উবাচ**-বললেন ; **অস্তি**-আছে ; **এব**-অবশ্যই ; **মে**-আমার ; **সর্বম্**-সমস্ত ; **ইদম্**-এই ; **ত্বয়া**-আপনার দ্বারা ; **উক্তম্**-উক্ত ; **তথাপি**-তবুও ; **ন**-না ; **আত্মা**-আত্মা ; **পরিতুষ্যতে**-শান্ত হয় ; **মে**-আমাকে ; **তৎ**-তার ; **মূলম্**-মূল ; **অব্যক্তম্**-অব্যক্ত ; **অগাধ-বোধম্**-অসীম জ্ঞানসম্পন্ন ; **পৃচ্ছামহে**-জিজ্ঞাসা করে ; **ত্বা**-আপনাকে ; **আত্ম-ভব**-স্বয়ং-জন্মা ; **আত্ম-ভূতম্**-সন্তান।

অনুবাদ

শ্রীব্যাসদেব বললেন ঃ আপনি আমার সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও আমার হৃদয় সন্তুষ্ট হচ্ছে না। তাই আমি আপনাকে আমার এই অসন্তোষের মূল কারণ জিজ্ঞাসা করছি, কেন না স্বয়ম্ভুব (ব্রহ্মা) সন্তান আপনি অসীম জ্ঞানের অধিকারী।

তাৎপর্য

জড় জগতে সকলেই দেহ-অথবা মনকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করে। এই দেহাত্ম-বুদ্ধিতে মগ্ন থাকার ফলে-তারা জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে। এই জড় জগতে লব্ধ সমস্ত জ্ঞান দেহ অথবা মনের সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং সেটাই হচ্ছে আমাদের সমস্ত অসন্তোষের মূল কারণ। সেই কারণটি অবশ্য সব সময় বুঝতে পারা যায় না। জড়জাগতিক জ্ঞানের সব চাইতে বড় পণ্ডিতের পক্ষেও তা খুঁজে বার করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের অসন্তোষের মূল কারণ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার জন্য নারদ মুনির মতো মহাজনের শরণাপন্ন হওয়া মঙ্গলজনক। নারদ মুনির শরণাগত কেন হতে হবে, তা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৬

স বৈ ভবান্ বেদ সমস্তগুহ্যমুপাসিতো যৎপুরুষঃ পুরাণঃ।
পরাবরেশো মনসৈব বিশ্বং সৃজত্যবত্যত্তি গুণৈরসঙ্গঃ ॥ ৬ ॥

সঃ-এইভাবে ; **বৈ**-অবশ্যই; **ভবান্**-আপনি ; **বেদ**-জানেন ; **সমস্ত**-সমস্ত ; **গুহ্যম্**-গোপনীয় ; **উপাসিতঃ**-ভক্ত ; **যৎ**-যেহেতু ; **পুরুষঃ**-পরমেশ্বর ভগবান ; **পুরাণঃ**-প্রাচীনতম ; **পরাবরেশঃ**-জড় জগৎ এবং চিৎ জগতের নিয়ন্তা ; **মনসা**-মনের দ্বারা ; **এব**-কেবল ; **বিশ্বম্**-জগৎ ; **সৃজতি**-সৃজন করেন ; **অবতি অত্তি**-ধ্বংস করেন ; **গুণৈঃ**-গুণের দ্বারা ; **অসঙ্গঃ**-অনাসক্ত।

অনুবাদ

হে প্রভু ! সমস্ত গোপন তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি অবগত, কেন না আপনি এই জড় জগতের সৃষ্টিকর্তা ও ধ্বংসকর্তা এবং চিৎ জগতের পালনকর্তা পরমেশ্বর ভগবানের উপাসনা করেন, যিনি জড় জগতের তিনটি গুণের অতীত।

তাৎপর্য

যে মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত, তিনি হচ্ছেন সমস্ত জ্ঞানের প্রতীক। ভগবদ্ভক্তির পূর্ণতা প্রাপ্ত এই ধরনের ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানের গুণাবলীতে ভূষিত। এই চিন্ময় ঐশ্বর্যের কাছে যোগীর অষ্টসিদ্ধি অত্যন্ত তুচ্ছ। পারমার্থিক পূর্ণতা প্রাপ্ত নারদ মুনির মতো ভক্ত তাঁর পারমার্থিক পূর্ণতার প্রভাবে অতি অদ্ভুত সমস্ত কার্য সম্পাদন করতে পারেন, যা সকলেই লাভ করার চেষ্টা করে থাকে। শ্রীল নারদ মুনি হচ্ছেন নিত্যসিদ্ধ জীব, কিন্তু তবুও তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ নন।

শ্লোক ৭

ত্বং পর্যটন্নর্ক ইব ত্রিলোকীমন্তশ্চরো বায়ুরিবাত্মসাক্ষী।
পরাবরে ব্রহ্মণি ধর্মতো ব্রতৈঃ স্নাতস্য মে ন্যূনমলং বিচক্ষ্ব ॥ ৭ ॥

ত্বম্-আপনি ; **পর্যটন**-ভ্রমন করেন ; **অর্কঃ**-সূর্য ; **ইব**-মতো ; **ত্রি-লোকীম্**-ত্রিভুবন ; **অন্তঃচরঃ**-সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেন ; **বায়ুঃইব**-সর্বব্যাপ্ত বায়ুর মতো ; **আত্ম**-আত্মতত্ত্বজ্ঞ ; **সাক্ষী**-সাক্ষী ; **পরাবরে**-কার্য এবং কারণ বিষয়ে ; **ব্রহ্মণি**-নির্গুন ব্রহ্মে ; **ধর্মতঃ**-ধর্মের অনুশাসন অনুসারে ; **ব্রতৈঃ**-ব্রততে ; **স্নাতস্য**-নিষ্ণাত ; **মে**-আমার ; **ন্যূনম্**-অসম্পূর্ণতা ; **অলম্**-স্পষ্টভাবে ; **বিচক্ষ্ব**-খুঁজে দেখুন।

অনুবাদ

সূর্যের মতো আপনি ত্রিভুবনের সর্বত্র বিচরণ করতে পারেন এবং বায়ুর মতো আপনি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেন। আপনি অন্তর্যামীর মতো সর্বব্যাপ্ত। তাই দয়া করে আপনি খুঁজে দেখুন ধর্ম আচরণে এবং ব্রত পালনে নিষ্ণাত থাকা সত্ত্বেও আমার অক্ষমতা কোথায়।

তাৎপর্য

দিব্য জ্ঞান, পূণ্য কর্ম, শ্রীবিগ্রহ আরাধনা, দান, ক্ষমা, অহিংসা এবং কঠোর নিয়মানুবর্তিতা সহকারে শাস্ত্র-অধ্যয়ন ভগবদ্ভক্তি লাভের পক্ষে সহায়ক।

শ্লোক ৮

শ্রীনারদ উবাচ

ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোহমলম্।
যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীনারদঃ-শ্রীনারদ ; **উবাচ**-বললেন ; **ভবতা**-তোমার

দ্বারা ; অনুদিত প্রায়ম্-প্রায় অপ্রশংসিত ; যশঃ-মহিমা ; ভগবতঃ-পরমেশ্বর ভগবানের ; অমলম্-নিষ্কলুষ ; যেন-যাঁর দ্বারা ; ইব-অবশ্যই ; অসৌ-তিনি (পরমেশ্বর ভগবান) ; ন-করে না ; তুষ্যেত-সন্তুষ্ট ; মন্যে-আমি মনে করি ; তৎ-তা ; দর্শনম্-দর্শন ; খিলম্-নিম্নতর।

অনুবাদ

শ্রীনারদ মুনি বললেন ঃ তুমি পরমেশ্বর ভগবানের অত্যন্ত মহিমান্বিত এবং নির্মল কীর্তি যথার্থভাবে কীর্তন করনি। যে দর্শন পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গুলির সন্তুষ্টি বিধান করে না, তা অর্থহীন।

তাৎপর্য

জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সম্পর্ক হচ্ছে-নিত্য প্রভু এবং নিত্য ভৃত্যের সম্পর্ক। ভগবান জীবরূপে নিজেকে বিস্তার করেছেন তাদের থেকেই প্রেমময়ী সেবা গ্রহণ করার জন্য, এবং সেটিই কেবল ভগবান এবং জীব উভয়েরই সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে। ব্যাসদেবের মতো মহাপ্রাজ্ঞ মহর্ষি বৈদিক শাস্ত্রকে অনেক বিস্তৃতরূপে সংকলন করেছেন এবং চরমে বেদান্ত-দর্শন প্রণয়ন করেছেন, কিন্তু তাদের একটিও সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করেনি। শুষ্ক দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা পরম-তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করলেও সরাসরিভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তন না করার ফলে মোটেই আকর্ষণীয় হয় না। পারমার্থিক জ্ঞানের শেষ কথা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। নির্বিশেষ ব্রহ্ম অথবা অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে যখন পরম-তত্ত্ব উপলব্ধ হয়, তাও পরমেশ্বর ভগবানের ভগবত্তার মহিমা উপলব্ধির দিব্য আনন্দের কাছে অতি নগণ্য।

বেদান্ত-দর্শনের রচয়িতা হচ্ছেন শ্রীল ব্যাসদেব স্বয়ং। তথাপি তিনি বিচলিত হয়ে পড়েছেন, যদিও তিনিই হচ্ছেন তার রচয়িতা। সুতরাং, বেদান্ত-দর্শনের রচয়িতা শ্রীল ব্যাসদেব যে ভাষ্য বিশ্লেষণ করেননি, সেই বেদান্ত-দর্শন পড়ে অথবা শুনে কি আনন্দ লাভ হতে পারে ? এখানে শ্রীমদ্ভাগবত-রূপে বেদান্ত-সূত্রের রচয়িতার বেদান্ত-ভাষ্য প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা উত্থাপন করা হয়েছে।

শ্লোক ৯

যথা ধর্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্যানুকীর্তিতাঃ।
ন তথা বাসুদেবস্য মহিমা হ্যনুবর্ণিতঃ ॥ ৯ ॥

যথা-যতখানি সম্ভব ; ধর্ম-আদয়ঃ-ধর্ম আচরণের চারটি তত্ত্ব ; চ-এবং ; অর্থাঃ-উদ্দেশ্যসমূহ ; মুনি-বর্য-হে মহান ঋষি, তোমার দ্বারা ; অনুকীর্তিতাঃ- পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হয়েছে ; ন-না ; তথা-সেইভাবে ; বাসুদেবস্য-পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ; মহিমা-মহিমা ; হি-অবশ্যই ; অনুবর্ণিতঃ-নিরন্তর বর্ণিত হয়েছে।

অনুবাদ

হে মহান ঋষি, যদিও তুমি ধর্ম আদি চতুবর্গ অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছ, কিন্তু তুমি পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের মহিমা বর্ণনা করনি।

তাৎপর্য

শ্রীনারদ মুনি তৎক্ষনাৎ শ্রীল ব্যাসদেবের অপ্রসন্নতার কারণ ঘোষণা করলেন। তাঁর অনুশোচনার মূল কারণ ছিল বিভিন্ন পূরাণে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তনে তাঁর ইচ্ছাকৃত অবহেলা। তিনি অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা স্থানে স্থানে বর্ণনা করেছেন, তবে তা ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের মতো এত বিস্তারিতভাবে করা হয়নি। এই চতুর্বর্গ ভগবদ্ভক্তির থেকে অনেক নিকৃষ্ট স্তরের বিষয়। বিদগ্ধ পণ্ডিত শ্রীল ব্যাসদেব সে কথা খুব ভালভাবেই জানতেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির উন্নত বৃত্তির প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান না করে তিনি অনেকটা অসঙ্গতভাবে তাঁর মূল্যবান সময়ের অপচয় করেছেন, এবং তাই তিনি এইভাবে বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এ থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত না হলে কেউই যথাযথভাবে সন্তুষ্ট হতে পারে না। সে কথা ভগবদগীতায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

চতুর্বর্গের চরম ফল 'মুক্তি'র পরেও পুরুষেরা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন। এই স্তরটিকে বলা হয় আত্মোপলব্ধির স্তর বা ব্রহ্মভূত স্তর। এই ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর জীব যথার্থভাবে প্রসন্ন হয়। কিন্তু এই প্রসন্নতা হচ্ছে দিব্য আনন্দের প্রাথমিক স্তর। এই আপেক্ষিক জগতে শান্তি এবং সমতা অর্জন করে পারমার্থিক স্তরে অগ্রসর হতে হয়। সমতা স্তর অতিক্রম করে জীব পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়। সেই নির্দেশ পরমেশ্বর ভগবান ভগবদগীতায় দিয়ে গেছেন। অর্থাৎ, ব্রহ্মভূত স্তরে স্থিত হলে এবং পরমার্থ উপলব্ধির মাত্রা বৃদ্ধি করতে হলে, নারদ মুনি শ্রীল ব্যাসদেবকে নির্দেশ দিলেন যে তাঁর কর্তব্য হচ্ছে, ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে বারংবার তিনি যেন ভগবদ্ভক্তির পন্থা বর্ণনা করেন। তার ফলে তাঁর প্রবল বিষাদ দূর হবে।

শ্লোক ১০

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিক্ক্ষয়াঃ ॥ ১০ ॥

ন-না ; যৎ-যা ; বচঃ-শব্দকোষ ; চিত্রপদম-সুসজ্জিত ; হরেঃ-পরমেশ্বর ভগবানের ; যশঃ-মহিমা ; জগৎ-জগৎ ; পবিত্রম-পবিত্র; প্রগৃণীত-বর্ণিত ; কর্হিচিৎ-অতি অল্প ; তৎ-তা ; বায়সম্-কাক ; তীর্থম্-তীর্থ ; উশন্তি-মনে করে ; মানসাঃ-সন্ত পুরুষেরা ; ন-না ; যত্র-যেখানে ; হংসাঃ-পারমার্থিক পূর্ণতাপ্রাপ্ত জীব ; নিরমন্তি-আনন্দ আস্বাদন করেছেন ; উশিক্ক্ষয়াঃ-যাঁরা ভগবদ্ধামে বাস করেন।

অনুবাদ

যে বাণী জগৎ পবিত্রকারী ভগবানের মহিমা বর্ণনা করে না, তাকে সন্ত পুরুষেরা কাকেদের তীর্থ বলে বিবেচনা করেন। ভগবদ্ধামে নিবাসকারী পরমহংসরা সেখানে কোন রকম আনন্দ অনুভব করেন না।

তাৎপর্য

কাক এবং হংসরা সমপর্যায়ভুক্ত পক্ষী নয়। কেন না তাদের মানসিক প্রবৃত্তি ভিন্ন। সকাম কর্মী অথবা বিষয়াসক্ত

(৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আদর্শ গৃহস্থ জীবন লাভের উপায়

এই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছে কিভাবে আপনি গৃহে থেকে আদর্শ গৃহস্থ জীবন লাভ করতে পারেন

-প্রেমাঞ্জন দাস

গৃহস্থের কর্তব্য

নিজের সুখের জন্য যত্ন করলে ভোগী গৃহব্রত হয়ে পড়তে হবে। কৃষ্ণ-সেবার জন্য নিখিল প্রয়াস করলে মঙ্গল হবে। যাঁরা স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে সর্বতোভাবে অনুক্ষণ কৃষ্ণভজন করছেন, তাঁদিগকে নানাভাবে সাহায্য বা সেবা করবার জন্য গৃহস্থ-ভক্তগণ অনুক্ষণ যত্নপর থাকবেন। তবেই গৃহস্থগণের মঙ্গল হবে, সংসারাসক্তি শিথিল হবে। যাঁরা পারমার্থিক গৃহস্থ অর্থাৎ গৃহস্থ-বৈষ্ণব, তাঁরা নিজের স্ত্রী-পুত্র কন্যার জন্য যেরূপ প্রচুর পরিশ্রম করেন, তদ্রুপ হরিসেবার জন্যও প্রচুর চেষ্টা করে থাকেন। নিজ স্ত্রী-পুত্র কন্যা প্রভৃতি ভগবদ্ভজন করছে জানলে তাদের পোষণ করেন, নতুবা দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষণ করেন না, তাদের সঙ্গ প্রতিকূল বা ভক্তিবাধক জেনে তফাৎ হয়ে যান।

আমি যখন প্রভু সাজতে চাই, অন্যের উপর প্রভুত্ব করতে চাই, তখনই মায়া বা প্রকৃতির বশীভূত হয়ে পড়ি। বর্তমান বিপন্ন মানবজাতির একমাত্র মঙ্গলকর কৃত্য হচ্ছে-এই যে সংসার-এই যে বোকামীর হাতে পড়েছি, তা হতে উদ্ধার লাভ করে কৃষ্ণ সংসারে প্রবিষ্ট হওয়া। নিষ্কপটে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করলেই সংসার হতে উদ্ধার লাভ হয়, অন্য উপায়ে হয় না। যে গুরুদেবের কৃপায় সংসার থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, সেই গুরু কি অভক্ত, অন্যাভিলাষী, কর্মী, ছলনাময় প্রচ্ছন্ন নাস্তিক, নির্ভেদ-জ্ঞানী বা যোগী হতে পারেন ? পরমপুরুষ ভগবানে সর্বতোভাবে ভক্তিবিশিষ্ট না হলে কি কেহ প্রকৃত গুরু হতে পারেন ?

গৃহস্থ বা বৈরাগী প্রত্যেকেরই গুরু-সেবাই প্রধান কর্তব্য। শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা সেবোন্মুখ কর্ণে পৌঁছিলে চক্ষুর অজ্ঞান-তিমির বিদূরিত হয়, তখন চক্ষু নির্মল হয় এবং সেই নির্মল চক্ষুতে কৃষ্ণদর্শন হয়ে থাকে।

আমার প্রভুত্বে ইচ্ছা আমার সর্বনাশের কারণ। যদি স্বেচ্ছায় প্রেয়ঃপথে চালিত হই-সংসার করতে দৌড়াই-সংসার নিয়ে ব্যস্ত হই, তবে ত্রিতাপ-জ্বালা অনিবার্য। সুতরাং মনের কথা ও মনোধর্ম লোকের কথা না শুনে যাঁরা সর্বক্ষণ ভগবৎ-সেবা করেন, তাঁদের উপদেশ সর্বতোভাবে শ্রবণ করা কর্তব্য।

পতিব্রতা ধর্ম

স্ত্রীলোকের পতিব্রতা ধর্ম সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির মহারাজ প্রশ্ন করলে পিতামহ ভীষ্ম তাঁকে শাণ্ডিলী-সুমনার কথোপকথন বিষয়টি বলতে লাগলেন। পতিপরায়ণা শাণ্ডিলী স্বর্গে গমন করলে সেই দেবলোকে সুমনা নাম এক দেবী তাঁর কাছে জানতে চাইলেন 'হে দেবি! কোন্ তপস্যার বলে তুমি সুদৃশ্য বিমানে এই স্বর্গলোকে এসেছ ?'

শাণ্ডিলী মধুরবাক্যে বলেন, "আমি বেশী কিছু তপস্যা করিনি। তবে আমি গৃহ-সংসারের কর্তব্য পালন করতাম। আমি আমার পতিকে কোনদিন অহিতকর বা কুবাক্য বলিনি। আমি আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করে চলতাম, গৃহদেবতার সেবা এবং আগত ব্রাহ্মণ, অতিথির সেবা করতাম। আমার স্বামী যখনই গৃহে ফিরে আসতেন তখনই তাঁকে বসার আসন দিয়ে তাঁর যথোচিত সেবা করতাম। তিনি যা খেতেন না, আমিও তা খেতাম না। তিনি কার্য উপলক্ষে বিদেশে গেলে আমি কেশ সংস্কার, গন্ধ, মাল্য, অঞ্জন ইত্যাদি প্রসাধনী দ্রব্য দিয়ে কখনও সাজতাম না। বরং সর্বদা সংযতচিত্ত হয়ে বিভিন্ন মঙ্গলকার্যে যুক্ত হতাম। পুত্র-কন্যা ও পরিজনদের জন্য যে সব কাজ করা দরকার, তা আমি রোজ সকালেই নিজেই সমাধান করতাম। কি প্রকাশ্যে কি অপ্রকাশ্যে কারও সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা কিংবা হাস্যজনক বা অহিত কর্ম করতে কখনও প্রবৃত্ত হইনি।

কখনও ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতাম না, কিংবা কারও সঙ্গে বেশী কথায় প্রবৃত্ত হতাম না। আমার স্বামী যখন নিদ্রাসুখ উপভোগ করতেন, তখন বিশেষ কাজ থাকলেও আমি তাঁকে পরিত্যাগ করে কোথাও যেতাম না। পরিবার প্রতিপালনের জন্য তাঁকে বেশী পরিশ্রম করতে অনুরোধ করে তাঁর বিরাগভাজন হতাম না। গৃহের সমস্ত কিছু সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখতাম।" এই সমস্ত পতিব্রতাধর্ম কীর্তন করে মহানুভবা শাণ্ডিলী তাঁর সমক্ষে অন্তর্হিত হলেন।

সরল জীবন যাপন ও উচ্চ চিন্তার আদর্শ গ্রহণীয়। কৃষ্ণভাবনাময় গৃহিনী সর্বদা কৃষ্ণভজনে আত্মনিয়োগ করে., তাঁকে নির্দিষ্ট সংখ্যক নাম জপ, বিগ্রহ পূজা, পুত্র- কন্যার পরিচর্যা, পতিসেবা এবং নিজেকে ধীর সংযত রেখে জীবন যাপন করতে হয়। তা হলে তিনি অন্তিমে ভগবদ্ধামে গতিলাভ করবেন।

উপদেশে উপাখ্যান

অহংকারে মন্দগতি

দৈত্যরাজ বলির পুত্রের নাম মন্দগতি। সে ছিল একলক্ষ হাতীর সমান বলবান। সে যুদ্ধ না করে থাকতে পারত না। তার মল্লযুদ্ধ করবার আগ্রহ প্রচুর। কিন্তু মানুষদের মধ্যে কোনও যোদ্ধা সে খুঁজে পেল না। শেষে মাতাল হাতীর মতো যাকেই সামনে পেত তাকেই কণুইর মধ্যে রেখে বাহুর চাপে মেরে ফেলতে লাগল। এইভাবে সে কয়েক জনকে মেরে ফেলে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় ত্রিত নামে এক মুনি সেই পথে যাচ্ছিলেন। ত্রিত মুনি মন্দগতির বাহুর ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলেন।

মুনি রেগে গিয়ে অভিশাপ দিলেন, 'রে দুর্মতি, তুই মাতাল হাতীর মতো মানুষদের মেরে ফেলছিস্, তাই তুই হাতী হয়ে জন্মলাভ কর্।' মন্দগতি সেই অভিশাপ শুনে চমকে উঠল। সে মুনির চরণে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল। মুনি বললেন, 'আমার বাণী মিথ্যা হবার নয়। তোর যেহেতু যুদ্ধ করবার মানসিকতা প্রবল তাই হাতী জন্মে যুদ্ধ করেই মরতে হবে। মথুরাতে জন্ম নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের হাতে মরবি।'

মন্দগতি অভিশপ্ত হয়ে হাতীজন্ম পেল। দশহাজার হাতীর বল ছিল তার। নাম কুবলয়াপীড়। কংস সেই হাতীকে দিয়ে কৃষ্ণকে জব্দ করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কৃষ্ণের হাতের আঘাত খেয়ে সে মারা গেল। অবশ্য মুনিচরণে ক্ষমা ভিক্ষার দরুন যার-তার হাতে না মরে শ্রীকৃষ্ণের হাতে তার মৃত্যু হল।

হিতোপদেশ

কারও অহংকার যখন বেড়ে যায় তখনই তার অপরাধের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অপরাধে দণ্ডভোগ করতেই হয়। তারপর তার সমস্ত দম্ভ অহংকার চূর্ণ হয়ে যায়।

পারের পয়সা

খেয়ার ঘাটে কিছু লোক জড়ো হয়েছিল। পারের কড়ি মিটিয়ে তারা নৌকায় বসেছিল। এমন সময় একজন লোক পয়সা না দিয়ে লুকিয়ে নৌকায় বসার চেষ্টা করল। তার কাছে কোন পয়সা ছিল না। খেয়া কর্তৃপক্ষ তার কাছে পয়সা চাইল। সে বলল, 'পয়সা আবার লাগে না কি ? এই তো একটু খানি ওপারে যাচ্ছি।'

লোকটিকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে নৌকা থেকে নামিয়ে দেওয়া হল। এত লোকের সামনে অপমানিত বোধ করে সে জিদ করে বলল, 'পয়সা আমি কখনই দেব না।'

তারপর সে খেয়াঘাট ছেড়ে অন্য পথ ধরে দ্রুত চলতে লাগল। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সে গভীর বনের মাঝে পথ হারিয়ে ফেলল। খুব কষ্টে সারারাত বনের মধ্যেই কাটালো।

তারপর ভোর হয়ে এল। সে ক্ষুধা ও ক্লান্তি উপেক্ষা করে লোকালয়ের খোঁজে চলতে লাগল। বহুক্ষণ পর সে একটি পথ পেল। শেষে দেখল সেই পথটি একই খেয়াঘাটের পথ। সেখানে গিয়ে খুব ক্লান্ত হয়ে সে কাঁদতে লাগল। লোকেরা বলল, 'তুমি তো পয়সা দেবে না জিদ করেছ, তবে কেন ভায়া, নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরিয়ে পার হয়ে যাও। নৌকায় তোমাকে বসতেই দেওয়া হবে না।' লোকটি তখন চিন্তা করল-পারের পয়সা না দিতে পারলে আমি এপারে থেকে কিছুতেই তো শান্তি পাব না। তাই সে পয়সা ভিক্ষা করতে লাগল। বহুক্ষণ ভিক্ষা করে পয়সা সংগ্রহ করল। তারপর পয়সা মিটাতে গেল। সেখানে অনেক কাকুতি ও ক্ষমা ভিক্ষা করে তবে সে পার হওয়ার সুযোগ পেল।

হিতোপদেশ

খেয়া পার হতে হলে সঙ্গে পয়সা রাখতেই হয়। ফাঁকি দিয়ে পার হওয়া যায় না। পরিণামে দুর্ভোগ পেতেই হয়। জন্মমৃত্যুর দুঃখকুণ্ঠাময় ভবনদী পার হয়ে বৈকুণ্ঠ জগতে যেতে হলে হরিভজনশীল হতে হয়। অহমিকার বশে হরিভজন না করলে পরিণামে হা-হুতাশ করতে হয়।

সকল এজেন্টদের প্রতি

সকল এজেন্টদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, 'ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে' পত্রিকা প্রচারে কারো কোনরূপ অনীহা বা অপারগতা থাকিলে, তাহা পূর্ব হতে জানাবেন। পত্রিকা পাঠানোর পরে, গ্রহন না করে পত্রিকার প্যাকেট ফেরত পাঠানো হলে, আমাদের প্রচার কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটে এবং আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, যেহেতু এজেন্টদের নিকট পত্রিকা পাঠানোর সম্পূর্ণ খরচ আমাদেরকে বহন করতে হয়। তাই সকল এজেন্টদের প্রতি অনুরোধ-পূর্ব অবগত করানো ছাড়া কেহ পত্রিকার প্যাকেট ফেরত পাঠাবেন না।

সকল গ্রাহকদের প্রতি

সকল গ্রাহকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ যে, কারো গ্রাহক মেয়াদ উত্তীর্ন হয়ে থাকলে, অবিলম্বে গ্রাহক ভিক্ষা যথাযথ ঠিকানায় পাঠিয়ে গ্রাহক নবায়ন করে শ্রীশ্রী রাধা মাধবের অপ্রাকৃত সেবায় এগিয়ে আসুন। গ্রাহক ভিক্ষা পাঠানোকালে গ্রাহক নম্বর অবশ্যই পরিস্কারভাবে উল্লেখ করবেন। এবং কারো ঠিকানা পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে অবশ্যই তাহা জানাবেন।

পত্রিকাটির যথাসময়ে গ্রাহক নবায়ন করুন এবং আপনার পাড়া-প্রতিবেশীকেও পত্রিকাটির গ্রাহক হতে উৎসাহিত করুন।

মঠে এত ভাল মন্দ খেয়েই এত রোগ ব্যাধি হয়েছে; ভোগেই দুঃখ, ত্যাগে শান্তি।

চিঠিপত্র

(প্রশ্নোত্তরদাতা ঃ শ্রী পুষ্পশীলা শ্যাম দাস ব্রহ্মচারী)

প্রশ্ন ঃ অমৃতের সন্ধানে পত্রিকায় বৈষ্ণব মতে ১১ দিনে শ্রাদ্ধের কথা বলা হয়েছে। যারা বৈষ্ণব নন এমন হিন্দুরা ১১ দিনে শ্রাদ্ধ করে শুদ্ধ হতে পারেন ?

প্রশ্নকর্তা ঃ- ডাঃ বিনোদ বিহারী মন্ডল, কামালকাঠী। পোঃ নওয়াবেকী, থানা ঃ শ্যামনগর, জিলা ঃ সাতক্ষীরা।

উত্তর ঃ বৈষ্ণবদের স্বঘোষিত কোন মত বা পথ নাই। শাস্ত্রের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে তারা জীবন যাপন বা আচার অনুষ্ঠান করে থাকেন। মূলত জীব মাত্রেই বৈষ্ণব। তবে অধিকাংশ জীবের মধ্যে এই বৈষ্ণবতা প্রচ্ছন্ন। মায়া দ্বারা আবরিত। আমরা সকলে সেই নিত্য সনাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সন্তান সন্ততি। আমাদের সেই পরম পিতা শ্রীকৃষ্ণের কাছেই আপনার জিজ্ঞাসার সিদ্ধান্ত জানা যাক–

পরমপিতা শ্রীকৃষ্ণ বললেন,

দশাহং শাবমাশৌচং সাপিন্ডে সুবিধীয়তেঃ।
জননেহিপ্যেবমেব স্যান্ত্রি পুনং শুদ্ধি নিশ্চিতাম ॥

গঃ পুঃ উঃ খঃ (৬/১০)

অর্থাৎ ঃ- সাপিন্ডদিগের মরণাশৌচ, অর্থাৎ মানুষ মারা গেলে দশাহ ১০ দিনে যারা নিপুনভাবে শুদ্ধির আকাঙ্খা করেন। তাদের পুত্রাদিগনেই দশাহ-১০ দিন অশৌচ পালন করে, একাদশাহে ১১ দিনে শ্রাদ্ধ করে শুদ্ধি লাভ করবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানব সমাজকে আবারও জানিয়ে দিলেন-

একোদিস্ট বিধানেন স্বাহা কারেন বুদ্ধিমান।
কুর্যাদেকা দশাহঞ্চ শ্রাদ্ধং সর্বং প্রযত্নতঃ ॥

অর্থাৎ বুদ্ধিমান মানবের উচিত একোদিষ্ট বিধানে স্বাহাকার মন্ত্র দ্বারা যত্ন সহকারে একাদশাহে ১১ দিনে শ্রাদ্ধ করা। এ থেকে প্রমাণ করে যে, একাদশ শ্রাদ্ধ শুধু বৈষ্ণবদেরই নয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানবের কথা উল্লেখ করেছেন।

আজ. তথাকথিত ব্রাহ্মনবাদের খপ্পড়ে পড়ে সে সমস্ত হিন্দু সমাজ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। দয়া করে ইসকন্ মন্দিরে যোগাযোগ করুন।

প্রশ্ন ঃ চতুরাশ্রম বা বর্নাশ্রম কি ?

প্রশ্নকর্তা ঃ পাকু কুমার দাস, গ্রাম ঃ ঝিলুয়া-পাহাড়পুর, হবিগঞ্জ।

উত্তর ঃ ব্রহ্মা যখন বহু কিছু সৃষ্টি করলেন, তেমনই সেগুলি পালন করার জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম নামক সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করলেন। কেননা বর্নাশ্রম ধর্ম ছাড়া ভগবানকে জানার কোন উপায় নাই। বিষ্ণু পুরানে বলা হয়েছে-

বর্ণাশ্রমাচরাবতা পুরুষেন পরপুমান।
বিষ্ণুরাধ্যতে পন্থা নানৎও তোষকারনাম্ ॥

অর্থাৎ-পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু, বর্ণ, ধর্ম, ও আশ্রম ধর্মের আচারযুক্ত পুরুষের দ্বারা আরাধিত হন। বর্নাশ্রম আচার ব্যতীত তাকে পরিতুষ্ট করার অন্য কোন উপায় নাই।

চারি বর্ণ ঃ ১। ব্রাহ্মণ ২। ক্ষত্রিয় ৩। বৈশ্য ৪। শুদ্র

চারি আশ্রম ঃ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস।

এই হল চারটি বর্ণ, চারটি আশ্রম। এই বর্নাশ্রম ধর্ম জন্মগত অনুসারে নয়। তা হচ্ছে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও গুণগত অনুসারে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন-

চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম বিভাগশ ঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম ॥

অনুবাদ ঃ প্রকৃতির তিনটি গুন কর্ম অনুসারে আমি মানব সমাজে চারিটি বর্ণবিভাগ সৃষ্টি করেছি। আমি প্রথার স্রষ্টা হলেও আমাকে অকর্তা এবং অব্যয় বলে জানবে।

ব্রাহ্মন ঃ (১) ব্রাহ্মন সত্ত্বগুনের দ্বারা প্রভাবিত। এবং নয়টি গুনে গুনান্বিত। সম, দমঃ, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ও আস্তিক্য।

(২) এরপর হচ্ছে ক্ষত্রিয়-এরা রাজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত শাসক সম্প্রদায়। ছয় গুণে গুণান্বিত।

শৌর্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান ও শাসনক্ষমতা এগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম।

(৩) তারপর বৈশ্য ঃ- এরা রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। এদের কর্ম হল-কৃষি, গোরক্ষা, ব্যবসা বাণিজ্য।

(৪) তারপর শুদ্র ঃ- শ্রমজীবি সম্প্রদায় এরা তমোগুনের দ্বারা প্রভাবিত।

ভগবান চারিটি বর্ণ বিভাগ সৃষ্টি করেছেন-যাতে মানুষ সুষ্ঠুভাবে পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারে। গুণ অনুসারে মানুষের কর্ম নির্ধারিত হয়। সেটা জন্ম অনুসারে নয়। যদি গুণগত কেউ ব্রাহ্মণ হয়, তাহলে তিনি নিম্ন তিন বর্ণের গুরু হতে পারেন। আর জন্মগত গুণহীন আত্মাভিমানী তথাকথিত ব্রাহ্মণ শুদ্রেরও গুরু হতে পারেন না। কেননা তিনি নিজেই শুদ্রাধম।

চারিটি আশ্রম ঃ- (১) ব্রহ্মচর্যঃ- শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল নারদমুনী বলেছেন-

ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বসন্দান্তোগুরুর্হিতম্
আচরণ দাসবন্নীচোগুরৌ সুদ্র সৌহাদ ॥

ব্রহ্মাচারীর কর্তব্য পুর্ণরূপে ইন্দ্রিয় সংযম করার মাধ্যমে বিনীতভাবে শ্রী গুরুদেক্ষবের প্রতি শ্রদ্ধা সহকারে সৌহার্দ পরায়ণ হয়ে দাসবৎ আচরণ করা। এভাবে মহাব্রত সহকারে সেই গুরুদেবের কাছ থেকে বিদ্যা অর্জন করা। এই শিক্ষা লাভ করতে হয়-পাঁচ থেকে পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত গুরুর

গৃহে।

(২) গার্হ্যস্থ ঃ- কেবল মাত্র সন্তান লাভের জন্য স্ত্রী সঙ্গ করতে পারে। সন্তান লাভ ব্যতীত স্ত্রী সঙ্গে যৌন সুখ ভোগ করা উচিত নয়। কেউ যদি আদর্শ গৃহস্থ জীবন যাপন করতে চায়, তাহলে তাকে বিধি নিষেধের দ্বারা যৌন-সুখ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

(৩) বানপ্রস্থ ঃ- অবশ্যই দেহ মন জিহ্বাকে এক সরলরেখায় স্থির করতে হবে। কায়, মন এবং বাক্যকে সংযত করার অনুশীলন করতে হবে। কেননা যাতে পূর্বের গার্হ্যস্থ আশ্রমের যৌন সুখ হৃদয়ে প্রবেশ না করতে পারে।

(৪) সন্ন্যাস আশ্রম ঃ- সন্ন্যাসীকে সমাজের শীর্ষস্থানীয় বা সমাজের সকল শ্রেণীর গুরু বলে গণ্য করা হয়েছে। সন্ন্যাসী হবেন কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ বেদবেদান্তবিদ এবং আচার্যবান বেদপুরুষ। সন্ন্যাসীর কর্ম কেবল কৃষ্ণনামের পশরা নিয়ে জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়ে কৃষ্ণ নাম বিতরণ করা। চতুরাশ্রমের মধ্যে এই সন্ন্যাস আশ্রম সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম।

প্রশ্ন ঃ দশবিধ সংস্কার কি কি ? এবং কিভাবে পালন করতে হয় ?

প্রশ্নকর্তা ঃ পাকু কুমার দাস, ঝিলুয়া, পাহাড়পুর, হবিগঞ্জ।

উত্তর ঃ দশবিধ সংস্কার বিষয়ে পর্যাক্রমে নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হল, যদি আপনি দশবিধ সংস্কার করতে চান, তাহলে ইসকনের পুরোহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

(১) গর্ভাধানঃ- ঋতু স্থানের পর শ্রীবিষ্ণুকে পাঁচবার অর্ঘ্য প্রদান করে ভগবানের অর্চনা করবে।

(২) পুংসবনম্ ঃ- গর্ভের তৃতীয় মাসে পতি প্রাতে স্নান করে শ্রীবিষ্ণুর পূজার্চনা করে চন্দ্র নামক অগ্নিসংস্থাপন করে হোম করবে।

(৩) সীমন্তোন্নয়নম্ ঃ- প্রথম গর্ভের প্রথম ষষ্ট বা অষ্টম মাসে প্রাতঃস্থান করে বিষ্ণু পূজার্চনা করে মঙ্গল নামক অগ্নি সংস্থাপন করে হোম করবে।

(৪) জাতকর্ম ঃ পুত্র ভূমিষ্ট হলে নাড়ী ছেদনের পর শ্রী বিষ্ণুর স্মরণ করবে।

(৫) নামকরন ঃ জন্মের পর দশরাত্র, শতরাত্র বা সম্বৎসর পূর্ণদিনে নামকরন কর্তব্য। প্রথমে স্থান করে শ্রীবিষ্ণুর অর্চনা করে পার্থিব নামক স্থাপন করে হোম করবে।

(৬) পৌষ্টিক কর্মঃ- জন্ম হতে সম্বৎসর পর্যন্ত মাসে মাসে জন্ম তিথীতে অথবা পুর্নিমা তিথিতে পিতা প্রাতঃ স্নান করে বলদ নামক অগ্নি স্থাপন করে হোম করবে।

(৭) অন্নপ্রাশন ঃ- পুত্র ষষ্ট বা অষ্টম মাসে, কন্যা পঞ্চম বা সপ্তম মাসে শুচি নামক অগ্নিস্থাপন করে হোম করবে।

(৮) চুড়াকরন ঃ- প্রথম, তৃতীয় বা পঞ্চম বর্ষে চুড়াকরণ কর্তব্য।

পিতা প্রাতঃস্নান করে বিষ্ণু অর্চন করে সত্য নামক অগ্নিস্থাপন করে হোম করবে।

(৯) উপনয়ন ঃ- অষ্টম থেকে দ্বাদশ বৎসর পর্যন্ত উপনয়ন করা কর্তব্য।

পিতা প্রাতঃস্নান করে শ্রীবিষ্ণুর পুজার্চনান্তে সমুদ্ভব নামক অগ্নিস্থাপন করে হোম করবে। প্রতিটি কর্মের শেষে সাধ্যানুসারে পঞ্চরাত্রিক ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব সেবা, দক্ষিনা প্রদান করবে।

(১০) বিবাহ ঃ উপনয়ন পরে জন্ম থেকে ২৫ পচিঁশ বৎসরের পরে বিবাহ কর্ম। এই হল দশবিধ সংস্কার।

(প্রশ্নোত্তরদাতা ঃ শ্রী মনোজ কৃষ্ণ দাস)

প্রশ্ন ঃ কিছুদিন আগেও এই পত্রিকায় 'প্রতিবাদ' কলাম দেওয়া হত। ইদানিং সেটি না দেওয়াতে পত্রিকার জনপ্রিয়তা কমেছে বলে মনে হয়। তাছাড়া 'প্রতিবাদ' কলাম দেওয়া হলে সকল সভ্য মানুষের চোখে নকল ভগবান-ভন্ড অবতারদের মুখোশ খুলে যাবে। কেন 'প্রতিবাদ' কলাম দেওয়া হয় না জানতে চাই।

প্রশ্নকর্তা- উজ্জ্বল কান্তি রায়, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।

উত্তর ঃ কলির নকল ভগবান আর ভূয়া অবতারদের মুখোশ খুলে দিতেই 'প্রতিবাদ কলাম' খোলা হয়েছিল। প্রতিবাদের প্রতিবাদকারী আমার শ্রদ্ধাভাজন সতীর্থ শ্রীমান জিতেন্দ্রিয় দাস মহাশয়ের বৈদিক শাস্ত্রের আলোকে দাঁতভাঙ্গা জবাবে নকল অবতার এবং ভূয়া ভগবানদের চেলারা গর্তে ঢুকেছে। বিষদাঁত ভাঙ্গা গোখর সাপের মত দু'চারদিন তারা একটু-আধটু ফোঁশফাঁশ করেছিল, প্রতিবাদ করেছিল। তাও ঠান্ডা করে দিয়েছেন জিতেন্দ্রিয় দাস। তিনি চ্যালেঞ্জ করে ঐ সব চেলাদের কাছে চিঠিও লিখেছিলেন- প্রকাশ্যে বিতর্ক সভায় তাদের নকল অবতার-ভগবানের পক্ষে একটি মাত্র শাস্ত্রীয় প্রমানের জন্য। তাতেই তাদের হার্ট এ্যাটাক করেছে।

সেই অবধি আর কোন প্রতিবাদ আসে নাই। প্রতিবাদ না এলেতো আর প্রতিবাদের প্রতিবাদ করা যায় না। তাই 'প্রতিবাদ কলাম' আপাতত বিরতি।

প্রশ্ন ঃ গৈরিকবসন পরিধানকারী ব্রহ্মচর্যব্রত পালনকারী টিকিধারী সাধুরা বিবাহ করতে পারে কি? গৈরিক বসনধারী ব্রহ্মচারীরা বিবাহ করলে হিন্দু সমাজে অনেকে নিন্দামন্দ করে। এতে সমাজের ক্ষতি হচ্ছে না কি?

প্রশ্নকর্তা ঃ ধ্রুব, শিববাড়ী, খুলনা।

উত্তর ঃ বৈদিক শাস্ত্রে মানবের জীবনকে চারটি আশ্রমে বিভাগ করা হয়েছে। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। সাধারণ লোকের ধারণা ব্রহ্মচারীরা বিবাহ করতে পারবে না- কিন্তু তাদের এই অশাস্ত্রীয় ভাবনা ঠিক নাই। ব্রহ্মচারীরা বিবাহ করতে পারবে না, এমন কথা কোনও শাস্ত্রে নাই। বরং ব্রহ্মচর্য পালনকারী ব্রহ্মচারীদেরই বিবাহ করার অধিকার শাস্ত্রে বর্ণনা করা আছে। ব্রহ্মচর্য পালন না করে বিবাহ করা শাস্ত্র অনুমোদিত নয়। বৈদিক এবং পৌরানিক কাল অবধি এই ধারা প্রবাহমান। এখন যেহেতু প্রায় কেহই ব্রহ্মচর্য পালন করে না-তাই ব্রহ্মচারীরা বিবাহ

করলে হিন্দু সমাজ বড় ধাক্কা খায়। নামমাত্র হিন্দু সমাজেতো এখন পচন ধরেছে। সমাজের যারা নিন্দুক তারা নিন্দা করবেই। সাধুরা ভাল কিছু করলেও ওরা নিন্দা করবে। ওরা সিদ্ধান্ত জানে না। হিন্দু সমাজে হাজার জনের মধ্যে একজন সম্যক সনাতন ধর্ম বিষয়ে জানা ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। গীতার (৯/৩০) এই শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ লিখেছেন, কোন ভক্ত যদি কোন নিন্দনীয় কার্য করেন, তবুও তাঁকে সাধু বা পুন্যবান ব্যক্তি বলে মনে করা উচিত। ভগবানের ভক্ত যদি কখনও কোন নিন্দনীয় কার্য করে ফেলেন, তবে তার খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। তা উপেক্ষা করা উচিত।

আর গৈরিক বসন বিবাহিত জীবনে পরিধান করা যাবে না। গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশের পূর্বেই গৈরিক বসন পরিত্যাগ করতে হবে। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দৃষ্টিতে গৈরিক বসন ত্যাগের প্রতীক। কিন্তু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মতে, অন্তরের পরিশুদ্ধতা না থাকলে বসন-ভূষনের গুরুত্ব নেই। অন্তর পবিত্র হলেই তবে বেশ-ভূষার গুরুত্ব আছে। অধুনা বৈষ্ণব সমাজে অপরিপক্ক অবস্থায় অনেকে গৈরিক বসন পরিধান করছে অথবা পরিধান করতে বলা হচ্ছে, যাদের বৈষ্ণবতা দূরে থাক নূন্যতম ভদ্রতাও নাই। এটা আপত্তিকর বটে।

প্রশ্ন ঃ রাধা কে ? রাধার প্রকৃত স্বরূপ কি ? রাধা শ্রীকৃষ্ণের কি হয় সম্পর্কে ?

প্রশ্নকর্তা ঃ অমলেন্দু হালদার, গ্রাম-জামুয়া, পোঃ মাদ্রা, পিরোজপুর।

উত্তর ঃ খাঁটি কৃষ্ণভক্ত নাহলে রাধারানীকে সম্যকভাবে জানা যায় না। এমনকি রাধা কে -এই প্রশ্ন করারও অধিকার জন্মায় না। ইস্কনে যোগদানের প্রাক্কালে আমার গুরুদেব শ্রীল জয়পতাকা স্বামী তাঁর শ্রীগুরুদেব শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদকে প্রশ্ন করেছিলেন 'রাধারানী কে ?' তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ গম্ভীরস্বরে জানান, 'তুমি কে, যে রাধারানী বিষয়ে জানতে চাচ্ছ?' স্বরূপত ঃ রাধারানী কৃষ্ণ-ই। কৃষ্ণই রাধা। রাধাই কৃষ্ণ। রাধাকৃষ্ণ একই স্বরূপ। লীলারস পুষ্টি সাধনের জন্য দ্বৈতরূপ। তবে তত্ত্বও অভেদ। প্রমান-মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ। অন্তরে কালিয়া বাহিরে রাই। দুই অঙ্গে নবদ্বীপে চৈতন্য গোসাঞ।। রাধাকৃষ্ণ ভেদহীন একতত্ত্ব হওয়ায় তাঁরা কোন জড় সম্পর্কে সম্পর্কিত নয়।

প্রশ্ন ঃ কুলগুরু কি ? পিতামাতার নির্বাচিত গুরু যদি মৎস্যভোজী হন, তাহলে ঐ পিতামাতার সন্তানরা দীক্ষা নেওয়ার জন্য অন্য সাত্ত্বিক আহারী গুরুর শরণাপন্ন হতে চাইলে কি তাতে কোন অপরাধ আছে ?

প্রশ্নকর্তা ঃ অনিমা গোস্বামী (প্রভাষক)
এবং অসিত বরণ চক্রবর্তী (অধ্যাপক)
নাকোল, শ্রীপুর, মাগুরা।

উত্তর ঃ কুলগুরু হল বংশানুক্রমে গুরুর ছেলে গুরু হওয়া। অথবা একই বংশের সকল সদস্য বংশানুক্রমে যেই গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন তিনিই কুল গুরু। পৌরানিক যুগে এই কুলগুরু প্রথার চল ছিল। কলিতে তা অচল। এখন গুরুর ছেলে গুরু হওয়াতো দূরের কথা, যথার্থ গুরুই পাওয়া দুষ্কর। তদুপরি গুরু যদি মৎস্যভোজী হয়, তবে তো তিনি গুরু নন। তিনি সর্বমাংসভূক্। উদর সর্বস্য। যেহেতু মৎস্য সমস্ত প্রাণীর মাংস ভক্ষন করে। তাই মহর্ষি মনু মৎস্য ভোজন একেবারেই নিষেধ করেছেন। মনু ৫/১৫॥

আর হ্যাঁ, পিতা-মাতার নির্বাচিত গুরুকেই সন্তানদেরও গুরু করতে হবে এমন নয়। তাও যদি মৎস্যভোজী হয়-তবেতো সর্বনাশ, পিতা-মাতাসহ সবংশের। সাত্ত্বিক আহারী অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রসাদভোজী এবং কৃষ্ণৈকনিষ্ঠা আচার্যবান বেদবেদান্ত শাস্ত্রসিদ্ধান্তবিদ ব্যক্তিকেই গুরু গ্রহন করতে হবে। পিতা-মাতার নির্বাচিত মৎস্যভোজী নামে মাত্র গুরুকে ত্যাগে কোন অপরাধ হবে না। বরং ত্যাগ না করলেই অপরাধ হবে। হরে কৃষ্ণ।

প্রশ্ন ঃ দীক্ষা না নিয়ে যদি কোন ব্যক্তি একাদশী পালন করে তবে কি, একাদশী পালন যথার্থ হবে ?

প্রশ্নকর্তা ঃ প্রসেনজিৎ দাস, সাংস্কৃতিক সম্পাদক (কর্ণফুলী), জামতলা বাজার, চট্টগ্রাম।

উত্তর ঃ পদ্মপুরাণে উল্লেখ আছে, আট বছর থেকে আশি বছর পর্যন্ত মনুষ্য মাত্রই একাদশী করা কর্তব্য। অর্থাৎ ছেলে হোক মেয়ে হোক সধবা হোক আর বিধবা হোক অথবা হোক বিপত্নীক- সকলের একাদশী পালন করা কর্তব্য। আর এ একাদশী ব্রত পালনের সাথে দীক্ষার কোন সম্পর্ক নেই। অতএব দীক্ষা না নিলেও একাদশী করা যাবে। একাদশী করা কর্তব্য। সেটিই যথার্থ।

হরে কৃষ্ণ
হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ
হরে হরে
হরে রাম
হরে রাম
রাম রাম
হরে হরে

কুইজ প্রতিযোগীতা

গত সংখ্যায় বর্ণিত প্রশ্নসমূহের উত্তর নিম্নরূপ ঃ

১। ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে সঞ্জয় এর দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে বলতে পারছিল।

২। কৃষ্ণভক্তকে কৃপা করতে কুণ্ঠিত বা চ্যুত হন না বলে শ্রীকৃষ্ণকে অচ্যুত বলা হয়েছে।

৩। মৃত্যুরূপ এবং স্বতন্ত্র চেতনার মাধ্যমে আত্মার উপস্থিতি সম্বন্ধে প্রমাণ হয়।

৪। ভগবান যেহেতু জীবের নিত্যকালের বন্ধু, তাই জীবের নিত্য কার্যকলাপ পর্যবেক্ষন করার জন্য জীবের সঙ্গে থাকেন।

৫। অর্জুন মহাশয়ের চারটি প্রশ্ন ঃ (১)স্থিতপ্রাজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি? (২) তিনি কিভাবে কথা বলেন? (৩) তিনি কিভাবে অবস্থান করেন? (৪) তিনি কিভাবে বিচরণ করেন?

গত সংখ্যায় বর্ণিত প্রশ্নসমূহের উত্তরদাতাদের মধ্য হতে বিজয়ী হলেন ঃ

প্রথম – দূর্গা বিশ্বাস। গ্রাম + পোঃ বামন হাট, জেলাঃ নড়াইল।
দ্বিতীয় – ঈশ্বর কুর্মী, গ্রাম ঃ গোবিন্দপুর, পোঃ ছোট ধামাই, মৌলভীবাজার।

কুইজ প্রতিযোগীতার নিয়ম হলো ঃ প্রতিটি প্রতিযোগীতায়ই মোট ৫টি করে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেয়া থাকিবে এবং প্রতিটি প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর প্রদান করতে হবে। যারা প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর প্রদানে সমর্থ হবেন, তাদের মধ্যহতে লটারির মাধ্যমে দু'জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।
প্রথম বিজয়ীকে ত্রৈমাসিক "অমৃতের সন্ধানে" পত্রিকাটি ২বৎসর এবং দ্বিতীয় বিজয়ীকে ১বৎসর বিনামূল্যে পাঠানো হবে।

চলতি সংখ্যায় প্রশ্নগুলি নিম্নরূপ ঃ

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীল প্রভুপাদ কোন্ ধরনের জড় পন্ডিতদের গর্দভ সদৃশ বলেছেন?
২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কয়টি ষটক রয়েছে ?
৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কত অধ্যায় কত শ্লোকে শুদ্ধ ভক্তের গুনাবলীর ব্যখ্যা করা হয়েছে ?
৪। অর্জুনকে সব্যসাচী বলা হয়েছে কেন ?
৫। পরমেশ্বর ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন, সেটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কত অধ্যায় কত শ্লোকে বলা হয়েছে?

উপরোক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর এর মধ্যে অবশ্যই 'অমৃতের সন্ধানে' ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

সম্পাদকীয়

পরম পিতার সাথে সংযোগ

আমরা সবাই কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কারণ আমরা সবাই কৃষ্ণের সন্তান। এক সন্তানের কখনও পিতার সাথে মতবিরোধ হতে পারে, কিন্তু তার পক্ষে সম্পর্কচ্ছেদ সম্ভব নয়। তার জীবনে তাকে প্রশ্ন করা হবে সে কে, এবং তাকে উত্তর দিতে হবে, "আমি অমুক ব্যক্তির সন্তান।" সেই সম্পর্কচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান এবং তাঁর সাথে সেই সম্বন্ধ শাশ্বত, কিন্তু আমরা শুধু তা ভুলে গেছি। কৃষ্ণ সর্বশক্তিমান, তিনি সম্পূর্ণ যশ, সম্পূর্ণ ধন, সম্পূর্ণ সৌন্দর্য ও সম্পূর্ণ জ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং সেই সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণ সর্বত্যাগীও। যদিও আমরা এমন এক মহান পুরুষের বন্ধু, তথাপি আমরা এ সব ভুলে গেছি। যদি এক ধনীর ছেলে তার পিতাকে ভুলে গিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, আর পাগল হয়ে সে হয়ত রাস্তায় ঘুমাতে পারে, অথবা খাবারের জন্য সে পয়সা ভিক্ষা করতে পারে, কিন্তু এ সবের কারণ তার ভুলে যাওয়ার জন্য। যাই হোক, যদি কেউ তাকে সংবাদ দেয় যে, সে শুধু দুঃখ ভোগ করছে, কারণ সে তার পিতার বাড়ি পরিত্যাগ করেছে, এবং সে অত্যন্ত ধনী ও বিশাল সম্পত্তির মালিক, তার পিতা তাকে ফিরে পাওয়ার জন্য উদ্বিগ্ন—তাহলে সে লোকটি একজন মহান হিতৈষী।

এই প্রাকৃত জগতে আমরা সব সময় ত্রিতাপ ক্লেশ ভোগ করছি—আধিআত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ক্লেশ। মায়া বা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে থাকার ফলে, আমরা এই সব দুঃখকে দুঃখ বলে গণ্য করি না। যাই হোক, আমাদের সব সময় জানা উচিত যে, ভৌতিক জগতে আমরা অনেক দুঃখ ভোগ করছি। যে যথেষ্ট বিবেকসম্পন্ন, বুদ্ধিমান, সেই অনুসন্ধান করে—কেন সে দুঃখ ভোগ করছে। "আমি দুঃখ চাই না। তথাপি কেন আমি দুঃখ ভোগ করছি?" এই প্রশ্ন জাগলেই কৃষ্ণভক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যেই আমরা কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করি, তিনি সাদরে আমাদের আহ্বান করেন। এটি ঠিক যেন হারানো সন্তান তার পিতার কাছে ফিরে গিয়ে বলছে, "বাবা' কিছু ভুল বুঝাবুঝির জন্য আমি আপনার আশ্রয় পরিত্যাগ করেছিলাম, কিন্তু আমি দুঃখ ভোগ করেছি। এখন আমি আপনার কাছে ফিরে এসেছি।" তখন পিতা তার ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে, আর বলে, "খোকা, আয়। তুই চলে যাওয়ার পর প্রতিদিন তোর জন্য আমি কত উদ্বিগ্ন ছিলাম এবং এখন আমি কত খুশি, যে তুই ফিরে এসেছিস্।" পিতা কত দয়ালু। আমাদের সেই একই অবস্থা। আমাদের কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, আর এটা খুব কঠিন নয়। পুত্র যখন পিতার কাছে আত্মসমর্পণ করে, এটা কি খুব কঠিন কাজ? এটা খুবই স্বাভাবিক যে, পিতা সব সময় পুত্রকে গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষা করছে। অপমানের কোন প্রশ্নই নেই। আমরা যদি আমাদের পরম পিতার কাছে মাথা নত করি এবং তাঁর চরণ স্পর্শ করি, তাতে আমাদের কোন ক্ষতি নেই এবং এটা কঠিনও নয়। বাস্তবিকপক্ষে এটা আমাদের কাছে গৌরবময়। আমরা করব না কেন? কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ দ্বারা তৎক্ষণাৎ আমরা তাঁর আশ্রয়ের অধীন হই আর সব দুঃখ থেকে মুক্ত হই। এই সব সমস্ত ধর্মশাস্ত্র দ্বারাই প্রমাণিত। *ভগবদ্গীতার* শেষে (১৮/৬৬) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

"সব রকম ধর্ম ত্যাগ করে শুধু আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সব পাপকর্মফল থেকে উদ্ধার করব। ভীত হয়ো না।"

ঈশ্বরের চরণে যখন আমরা আত্মসমর্পণ করি' তখন আমরা তাঁর আশ্রয়ের অধীন হই, এবং সেই সময় থেকে আমাদের আর কোন ভয় থাকে না। সন্তানেরা যখন তাদের পিতামাতার আশ্রয়ের অধীন থাকে, তারা তখন নির্ভীক, কারণ তারা জানে যে তাদের পিতা-মাতা তাদের কোন ক্ষতি হতে দেবে না।

'মামেব যে প্রপদ্যন্তে'—শ্রীকৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, যারা তাঁর শরণাগত হবে, তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই।

যদি কৃষ্ণের শরণাগত হওয়া তত সহজ ব্যাপার, তাহলে লোকে তা করে না কেন? পক্ষান্তরে অনেকে আছে যারা ভগবানের অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করছে এবং দাবি করছে যে, প্রকৃতি ও বিজ্ঞানই সব, আর ভগবান বলতে কিছু নেই। জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে তথাকথিত সভ্যতার উন্নতির অর্থ হচ্ছে যে, জনসাধারণ অধিকতর উন্মাদগ্রস্ত হচ্ছে। তাই আরোগ্য লাভের পরিবর্তে রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। লোকে ভগবানকে গ্রাহ্য করে না কিন্তু তারা প্রকৃতিকে মান্য করে, এবং প্রকৃতির কাজ হচ্ছে—ত্রিতাপ ক্লেশের মাধ্যমে তাদের লাথি মারা। সে সবসময় দিনে ২৪ ঘণ্টা লাথি মেরে শাসন করছে। যাই হোক, আমরা লাথি খেতে খেতে এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, সেগুলি সাধারণ জিনিসের মতোই মনে করি। আমরা আমাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ গর্বিত হয়ে পড়েছি, আমরা জড়া-প্রকৃতিকে বলি, "আমাকে লাথি মারার জন্য ধন্যবাদ।

(১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্ম-মৃত্যুরূপ ভবসমুদ্র হতে
তাঁর শরণাগত ভক্তদের রক্ষা করেন